ইউনিট ৬ঃ শিক্ষার সামাজিক ভিত্তিসমূহ

Social Bases of Education

ভূমিকা

এমএড প্রোগ্রামের জন্য রচিত **শিক্ষার ঐতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিক ভিত্তি–** শীর্ষক কোর্সটিকে মূলতঃ দুটি অংশে ভাগ করা যায়। এর প্রথম অংশটিতে (ইউনিট ১-৫) শিক্ষার ভিত্তিরূপে যে বিষয়গুলো কাজ করেছে সে সকল ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে এবং দ্বিতীয় অংশে (ইউনিট ৬-৮) শিক্ষার ভিত্তি হিসেবে সামাজিক যে সব বিষয়াদি নিহিত রয়েছে তার ওপরে আলোকপাত করা হয়েছে। শিক্ষার ভিত্তিকে জানার জন্য এর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সংশ্লিষ্টতাকে চিহ্নিত করা। বিশেষ করে শিক্ষকতা পেশায় শিক্ষার সামাজিক ভিত্তিকে উপলব্ধি না করলে শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রমকে সফল করা সম্ভব নয়। বর্তমান ইউনিটকে **১২**টি পাঠে বিভক্ত করে শিক্ষার সামাজিক ভিত্তিগুলো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

পাঠ ৬.১ঃ পরিবেশ ও শিক্ষা
পাঠ ৬.২ঃ পরিবার ও শিক্ষা
পাঠ ৬.৩ঃ জেন্ডার ও শিক্ষা
পাঠ ৬.৪ঃ শিক্ষার জনমিতিক উপাদান
পাঠ ৬.৫ঃ সামাজিক স্তরবিন্যাস ও শিক্ষা
পাঠ ৬.৬ঃ শিক্ষার গ্রামীণ ও নগর প্রেক্ষিত
পাঠ ৬.৭ঃ শিল্পায়ন ও শিক্ষা
পাঠ ৬.৮ঃ নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী ও শিক্ষা
পাঠ ৬.৯ঃ সংস্কৃতি ও শিক্ষা
পাঠ ৬.১০ঃ নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ, সামাজিক আদর্শ, মনোভাব ও শিক্ষা
পাঠ ৬.১১ঃ রাষ্ট্র, সরকার, আমলাতন্ত্র এবং শিক্ষা
পাঠ ৬.১২ঃ অর্থনীতি ও শিক্ষাঃ চাহিদা-যোগান ও সামাজিক প্রেক্ষিতে শিক্ষার ব্যয়

পাঠ ৬.১: পরিবেশ ও শিক্ষা
Environment and Education

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- পরিবেশ বলতে কী বুঝায় তা বলতে পারবেন।
- শিক্ষার পরিবেশ বলতে কী বুঝায় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- শিক্ষাক্ষেত্রে পরিবেশের গুরুত্ব নির্ণয় করতে পারবেন।
- শিক্ষাক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তারকারী পরিবেশের উপাদানগুলোর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা উল্লেখ করতে পারবেন।

পরিবেশ

শিক্ষাক্ষেত্রে বংশগতি ও পরিবেশের প্রভাব নিয়ে চিন্তাবিদদের মধ্যে বির্তক রয়েছে। বংশগতিবাদীদের (গ্যাল্টন ও পিয়ারসন, ডাগডেল, গডার্ড, নিউম্যান প্রমুখ) মতে শিশুর শিক্ষার জন্য তার বংশগতি একান্ত প্রয়োজন। অন্যদিকে পরিবেশবাদীরা (স্টারবুক, ক্যাটল, বারবারা বার্কস, ফ্রীম্যান, রুশো প্রমুখ) মনে করেন মানুষের জীবন বিকাশ এবং শিক্ষারক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো পরিবেশ। তাঁরা মনে করেন শিক্ষা হলো জীবন বিকাশের কৌশল। তাই শিক্ষার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ একান্ত প্রয়োজন।

পরিবেশ ও শিখন পরিবেশ

সাধারণভাবে ব্যক্তির চারপাশে যা কিছু পরিবেষ্টিত করে আছে তাকেই বলা হয় পরিবেশ। আর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভিতরের বা বাইরের যে অবস্থা এবং উপাদানসমূহ ব্যক্তির শিক্ষাকে প্রভাবিত করে সেগুলো নিয়েই গঠিত হয় শিক্ষার পরিবেশ, যাকে শিক্ষার ভাষায় ‘শিখন পরিবেশ’ বলা হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে শিখন পরিবেশের ওপর প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানগুলোর মধ্যে এর অবস্থান, অবকাঠামো, প্রেক্ষাপট, সংস্কৃতি (যার মধ্যে শিক্ষার্থীরা শিখে) উল্লেখযোগ্য। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরে পরিবেশের যে উপাদানগুলো ব্যক্তির শিক্ষাকে প্রভাবিত করে সেগুলো হলো পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, সামাজিক প্রেক্ষাপট ইত্যাদি। তবে ব্যক্তির আনুষ্ঠানিক শিক্ষারক্ষেত্রে শিখন পরিবেশের মান এবং বৈশিষ্ট্য নির্ধারণে প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা, পরিচালনা কাঠামো বিশেষ ভূমিকা রাখে।

শিক্ষায় পরিবেশের গুরুত্ব

শিক্ষাবিদদের মতে ব্যক্তির শিক্ষা/শিখনে পরিবেশের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব রয়েছে। শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ শিশু/ব্যক্তিকে শিক্ষায় সংশ্লিষ্ট হতে সাহায্য করে; শিক্ষার্থীর মধ্যে শিক্ষা গ্রহণের প্রেষণা সৃষ্টি করে। ভালোভাবে শিক্ষা গ্রহণের মানসিকতা ও শিক্ষার প্রতি একাত্মতাবোধ সৃষ্টি করে। ফলে কার্যকর ও ফলপ্রসূ হয়। আর শিখন কার্যকর হলে শিক্ষার্থীর শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ভালো হয় যা তাকে ভবিষ্যতে সামাজিক ও কর্মজীবনের জন্য উপযুক্তভাবে গড়ে উঠতে সহায়ক হয়।

শিশুর/ব্যক্তির শিক্ষার এ পরিবেশ আসলে মায়ের গর্ভ থেকেই তৈরি হয়। সেখানে সে উপযুক্ত পরিবেশ পায় বলেই নির্দিষ্ট সময় পর সে পূর্ণাঙ্গ শিশু হিসেবে জন্মগ্রহণ করে। শিশুকে জন্মের পর থেকে ঠিকভাবে জীবন পথে পরিচালিত করতে হলে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ দিতে হবে। পরিবেশ যথার্থ হলে শিক্ষাও ভাল হবে। পরিবেশ যদি উপযুক্ত না হয় শিক্ষার কাজ সার্থক হবে না।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান দায়িত্ব হলো শিক্ষার কাজ পরিচালনা করা। এ দায়িত্ব পালনের জন্যই প্রাথমিক থেকে উচ্চ পর্যায় পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্ম। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো যে মহান উদ্দেশ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা পরিপূরণের যথাযথ পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। তা না হলে ব্যক্তির সামাজিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক, আবেগিক, দৈহিক, মানসিক ইত্যাদি দিকগুলোর যথাযথ বিকাশ ব্যাহত হবে, যা তাকে পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে বাধাগ্রস্থ করবে।

শিক্ষা পরিবেশের উপাদান

শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টিতে শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শ্রেণিকক্ষের শিখন পরিবেশের গুণগতমান যে বিষয়গুলোর উপর নির্ভর করে তা হলো−

১. **শ্রেণিকক্ষের কাঠামোগত পরিবেশ:** এর অন্তর্ভুক্ত উপাদানগুলো হলো এর গঠন, শিক্ষার্থী সংখ্যা, ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি। এ দিকগুলো সুসংগঠিত হলে শিখন ভালো হয়। গবেষণায় দেখা গিয়েছে শিক্ষার্থী সংখ্যা কম হলে তাদের মধ্যে বন্ধন দৃঢ় হয়, শিক্ষক সকলকে শিক্ষণীয় কাজে সক্রিয় রাখতে পারেন। সকলের প্রশ্ন করতে, নজর রাখতে পারেন। ফলে শিখন ভালো হয়।
২. **শ্রেণিকক্ষের শিক্ষামূলক পরিবেশ:** শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর পারস্পরিক সম্পর্ক ও ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার বর্তমান অবস্থা, শিক্ষার্থীদের নিজেদের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্ক, শিক্ষক ও প্রতিষ্ঠানের প্রশাসকের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্ক ইত্যাদি এর অন্তর্ভুক্ত। এ সম্পর্কগুলো ঘনিষ্ঠ ও ইতিবাচক হলে অধিকতর মাত্রায় শিখন সংঘঠিত হয়।
৩. **শ্রেণিকক্ষের মানসিক পরিবেশ:** শ্রেণির শিক্ষামূলক কাজের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের মানসিকতা সৃষ্টি, শিক্ষকের সহায়তা, শিখন উদ্দেশ্য অর্জনের প্রচেষ্টা এর অন্তর্ভুক্ত। এ দিকগুলো প্রত্যাশা অনুযায়ী করা গেলে শিক্ষার্থীরা শিক্ষা গ্রহণের প্রেষণা অনুভব করে। ফলে শিখন ভালো হয়।
৪. **শিক্ষকের ভূমিকা:** শিখন পরিবেশ সৃষ্টিতে শিক্ষকের আচরণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষক হবেন বন্ধুভাবাপন্ন, দায়িত্বশীল, মেন্টর প্রশিক্ষিত এবং পেশাগত দায়িত্বের প্রতি প্রতিশ্রতিবদ্ধ। শিক্ষা বিষয়ে থাকবে তার সুস্পষ্ট ধারণা, নির্দেশনা, দায়িত্ববোধ ও জবাবদিহিতা।

শিক্ষার উন্নয়নে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা

শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো ব্যক্তি জীবনের বিকাশ সাধন করা। শিশু/ব্যক্তি যদিও জন্মগতভাবে অনেক বৈশিষ্ট্য নিয়ে আসে তথাপি যথাযথ শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে সেগুলোর বিকাশ সাধন ও নতুন নতুন জ্ঞান ও দক্ষতা সৃষ্টি সম্ভবপর হয়ে উঠে।

শিশুর জন্মের পর একটি নির্দিষ্ট সময় পর আনুষ্ঠানিকভাবে শিক্ষা গ্রহণের জন্য বিদ্যালয়ে আসে। তারপর জীবনের ধারাবাহিকতায় আরও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সে শিক্ষা গ্রহণের জন্য যায়। এসব প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ ভালো হলে তা শিশুকে প্রত্যাশা অনুযায়ী বিকশিত হতে সাহায্য করে যার অন্যতম নিয়ন্ত্রক হচ্ছেন শিক্ষক। শিক্ষক বিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রিত পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে শিশুর শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করেন। সুতরাং এ পরিবেশ যদি যথাযথ না হয় তবে শিশুর শিক্ষা ব্যাহত হবে। সে কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রধান দায়িত্ব শিশুর শিক্ষার যথাযথ পরিবেশ সৃষ্টি করা। এ উদ্দেশ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিম্নোক্ত বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে। যথা−

১. **বিদ্যালয় পরিবেশ:** শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশকে উন্নত করতে হবে। সব ক্ষেত্রে যাতে পাঠ গ্রহণের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি হয় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। শ্রেণিকক্ষের আয়তন ও সাজ-সজ্জা পাঠের অনুকূল এবং পর্যাপ্ত আলো বাতাস থাকবে। গ্রন্থাগারে শিক্ষার্থীদের উপযোগী ভালো বই ও পড়ার ভালো ব্যবস্থা থাকতে হবে।

২. **শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক:** শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক-শিক্ষার্থী ঘনিষ্ঠ মানবীয় সম্পর্ক স্থাপন করতে না পারলে শিক্ষা গ্রহণের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হবে না। বিদ্যালয় পরিবেশ শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের মানবীয় পরিবেশ সৃষ্টি উপযোগী হতে হবে। শিক্ষার্থী-শিক্ষার্থী, শিক্ষার্থী-শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও তার দল, উপর ও নিচের শ্রেণির শিক্ষার্থীর মধ্যে সম্পর্ক– এমনি নানা ধরনের সম্পর্ক তৈরির ক্ষেত্র হল বিদ্যালয়। শিক্ষক ও বিদ্যালয় যদি এ ধরনের পরিবেশ না তৈরি করতে পারেন তাহলে শিক্ষার আদর্শ পরিবেশ তৈরি হবে না।

৩. **শিক্ষকের আধুনিক জ্ঞান:** শিক্ষা সহায়ক বিভিন্ন ধরনের আধুনিক শিক্ষা উপকরণ বিদ্যালয়ে থাকতে হবে ও শ্রেণির কাজে সেগুলো ব্যবহৃত হতে হবে। এছাড়া শিক্ষকের তার শিক্ষণীয় বিষয়ে আধুনিক জ্ঞান থাকতে হবে। তিনি জ্ঞানের দিক থেকে পিছিয়ে থাকলে শিক্ষার্থীদের যুগোপযোগী করে গড়ে তুলতে পারবেন না।

৪. **প্রেষণার উপযোগী পরিবেশ:** প্রেষণা শিক্ষা গ্রহণের অন্যতম প্রভাবক। তাই শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষা গ্রহণের প্রেষণা সৃষ্টি করতে হবে। এটা করতে হলে শিক্ষার্থীদের পূর্ব অভিজ্ঞতাকে গুরুত্ব দিতে হবে। তাদের পছন্দীয় ও আধুনিক শিখন শেখানো প্রক্রিয়া ব্যবহার করতে হবে। শিক্ষার বিষয়বস্তু জীবনঘনিষ্ঠ হবে। শিক্ষা বিষয়ে শিক্ষক সুস্পষ্ট নির্দেশনা দিবেন। শিক্ষার্থীর উপযোগী করে তথ্য ও জ্ঞানের সঞ্চালন করতে হবে। শিক্ষক হবেন ইতিবাচক ও সহায়ক মনোভাবাপন্ন। প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো শিক্ষার্থীর জন্য বন্ধুভাবাপন্ন হতে হবে।

৫. **শিক্ষামূলক চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা:** শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অবসর সময়ে শিক্ষার্থীরা যাতে সুস্থভাবে শিক্ষামূলক কাজের মাধ্যমে সময় কাটাতে পারে তার ব্যবস্থা থাকতে হবে। খেলাধুলার ব্যবস্থা থাকতে হবে। শিক্ষামূলক চলচিত্র প্রদর্শন, শিক্ষামূলক ভ্রমণ, ভাষা ক্লাব, বিতর্ক ক্লাব প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি কর্মকাণ্ডের আয়োজন করতে হবে। এর ফলে শিক্ষার্থীরা একঘেঁয়েমি থেকে মুক্তি পাবে ও তাদের ব্যক্তিত্ব গঠনেও সহায়ক হবে।

৬. **শিক্ষার্থীর স্বাধীনতা:** শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সুপরিবেশ গড়ে তুলতে হলে শিক্ষার্থীদের স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ দিতে হবে। যে পরিবেশে শিক্ষার্থীরা স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে না, সে পরিবেশ তাদের জন্য জেলখানাস্বরূপ।

৭. **শিক্ষার্থীর মতামত প্রকাশের সুযোগ:** বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে শিক্ষার্থীদের মত প্রকাশের সুযোগ থাকতে হবে। তাহলে তার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতি অধিকতর একাত্মতা অনুভব করবে যা তাদের শিক্ষাকে জোড়দার করবে।

৮. **নির্দেশনা প্রদান:** শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগ্য শিক্ষক নিয়োগের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ও উপযুক্ত শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক নির্দেশনা দিতে হবে। শিক্ষার্থীদের সমাজের প্রয়োজনের উপযোগী করে গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন সমাজ কল্যাণমূলক কাজ পরিচালনার দলগত কর্মকাণ্ডের নির্দেশনা দিতে হবে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যদি শিক্ষার্থীকে তার জীবন বিকাশের উপযোগী উপরিল্লখিত পরিবেশ দিতে পারে, তাহলে শিক্ষার্থীরা শিখনের প্রেষণা অনুভব করবেন। তাই ভালো শিক্ষা পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে শিশুর নিজস্ব সম্ভাবনার বিকাশ ও সামাজিক চাহিদার পরিপূরণে আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.১

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. মানসম্মত শিক্ষার জন্য কোনটি বিশেষভাবে প্রয়োজন?
- ক. পরিবেশ
- খ. উপযুক্ত শিখন পরিবেশ
- গ. অবকাঠামো
- ঘ. পরিবারের ভালো অর্থনৈতিক অবস্থা

২. শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার মানসিক পরিবেশ তৈরিতে শিক্ষকের ভূমিকা কী ধরনের হওয়া উচিত?
- ক. অধিক সক্রিয় হওয়া
- খ. শিক্ষার্থীদের পাঠে বাধ্য করা
- গ. শাস্তি দেওয়া
- ঘ. শিক্ষার্থীদের সাহায্য ও পাঠে উদ্বুদ্ধ করা

৩. শিক্ষার্থীকে সমাজের প্রয়োজনের উপযোগী করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রত্যশিত ভূমিকা কোনটি?
- ক. সমাজ কল্যাণমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা
- খ. শিক্ষার্থীদের মত প্রকাশের সুযোগ দেওয়া
- গ. প্রেষণা সৃষ্টি করা
- ঘ. আধুনিক জ্ঞান প্রদানের ব্যবস্থা করা

উত্তরমালা: ১. খ, ২. ঘ, ৩. ক

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. শিখন পরিবেশ বলতে কী বুঝায়?
২. শিক্ষায় পরিবেশের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন।
৩. শ্রেণিকক্ষের কাঠামোগত পরিবেশ কী ধরনের হওয়া উচিত?
৪. শিক্ষার ও শিক্ষার্থীর মধ্যে কী ধরনের সম্পর্ক থাকা উচিত?

খ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. শ্রেণিকক্ষ পরিবেশের গুরুত্ব ও উপাদানগুলো বর্ণনা করুন।
২. শিক্ষার উন্নয়নে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা ব্যাখ্যা করুন।
৩. আমাদের দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিদ্যমান শিখন পরিবেশ মূল্যায়ন করুন ও মানোন্নয়নের সুপারিশ প্রদান করুন।

পাঠ ৬.২: পরিবার ও শিক্ষা
Family and Education

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- পরিবারের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- পরিবারের প্রকারভেদ ও কার্যাবলি উল্লেখ করতে পারবেন।
- শিক্ষার ধারণা ব্যক্ত করতে পারবেন।
- পরিবার ও শিক্ষার সম্পর্ক এবং শিক্ষায় পরিবারের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

পরিবার

পরিবার (Family) একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান (Social Institution) এবং সমাজ কাঠামোর (Social Structure) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মৌল অঙ্গ সংগঠন। সমাজবিজ্ঞানীদের মতে, পরিবার হচ্ছে মানব সমাজের সবচেয়ে প্রাচীন, আদি, মৌলিক ও ক্ষুদ্রতম প্রতিষ্ঠান (Institution)। তাই পরিবারকে সমাজের মুখ্য বা প্রাথমিক গোষ্ঠী হিসেবেই বিবেচনা করা হয়। পরিবার হলো সমাজের কেন্দ্রবিন্দু। মানব সমাজের উষালগ্ন থেকেই পরিবারের অস্তিত্ব দৃশ্যমান হয়েছে। পরিবারবিহীন সমাজের চিত্র কল্পনা করা যায় না। আদি থেকে বর্তমান পর্যন্ত সব সমাজেই পরিবার দৃষ্ট হয়েছে। হয়তো এর বিবর্তন ঘটেছে, রূপ বদলেছে কিন্তু সমাজে পরিবারের স্থায়ী আসন কখনো বিলুপ্ত হয়নি। এর প্রয়োজনীয়তা ফুরায়নি। এর অন্যতম কারণ হলো মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করা মানুষের বৈশিষ্ট্য। মানুষ একাকী থাকতে পারে না। স্বভাবতই মানুষ সঙ্গপ্রিয়। একে অন্যের পারস্পরিক সহযোগিতায় একত্রে মিলেমিশে বাস করতে চায় যা মানুষের সহজাত বৈশিষ্ট। এই সহজাত প্রবৃত্তিই মানুষকে পরিবার গঠনে ধাবিত করেছে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত একজন মানুষ পরিবারের আবহেই অবস্থান করে। পরিবারের মধ্যেই একজন মানুষ জন্মগ্রহণ করে, লালিত-পালিত হয়, বেড়ে ওঠে, শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়, কর্ম করে এবং এক সময় পরিবারের মধ্যেই সে মুত্যুবরণ করে। এমন কি মৃত্যুর পর তার শেষ কৃত্যের অনুষ্ঠান পর্যন্ত পরিবারের মধ্যেই সম্পন্ন হয়। তাই বলা যায়, পরিবার একটি স্থায়ী ও সর্বজনীন (Universal) সামাজিক প্রতিষ্ঠান।

পরিবারের সাধারণ ধারণা

সাধারণভাবে পরিবার বলতে বোঝায় কতিপয় ব্যক্তির সমষ্টিকে যারা একত্রে বসবাস করে এবং যাদের মধ্যে প্রত্যক্ষ ও আন্তরিক সম্পর্ক বিরাজ করে। বিবাহ, রক্ত সম্পর্ক ও আত্মীয়তা সূত্রের বন্ধনে আবদ্ধ একটি সামাজিক গোষ্ঠী (Social Group) হলো পরিবার। পরিবার হলো অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ, আন্তরিক ও মুখোমুখি সম্পর্কযুক্ত (Face to face relationship) একটি মৌলিক সামাজিক প্রতিষ্ঠান। যেখানে পরিবারের বাইরের কোনো ব্যক্তির স্থান নেই। অবশ্য দত্তক গ্রহণের মাধ্যমে পরিবার বহির্ভূত ব্যক্তিকে পরিবারের অন্তর্ভূক্ত করা হয়। তখন সেই ব্যক্তি আর অন্য পরিবারের সদস্য থাকে না, হয়ে যায় সেই পরিবারভুক্ত। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে প্রতিনিয়ত পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া (Interaction) চলতে থাকে। প্রত্যেক পরিবারের নিজস্ব আদর্শ, ঐতিহ্য, প্রথা থাকে যা সেই পরিবারের সদস্যরা বজায় রাখে, সযত্নে লালন করে ও সে অনুযায়ী তাদের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে। পরিবারের ধারণা বিচার বিশ্লেষণ করে বলা যায়, নারী-পুরুষের বিবাহের মাধ্যমে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের ভিত্তিতে সন্তান প্রজনন ও বংশ রক্ষার আকাঙ্ক্ষা থেকে পরিবার গঠিত হয়। তাই পরিবারকে একটি জৈব একক (Biological Unit) বলেও অভিহিত করা যায়।

পরিবারের মার্কসীয় ধারণা

পরিবার সম্পর্কে মার্কসীয় একটি ধারণা প্রচলিত আছে। কার্ল মার্কসের (Karl Marx) ঘনিষ্ঠ সহচর এঙ্গেলস (F. Engels) পরিবার সম্পর্কে তার দুটি রচনায় "The origin of family" এবং "Private property and the state"-এ বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন। মার্কসীয় ধারণা মতে, আদিম সমাজ ব্যবস্থায় শিকার ও খাদ্য সংগ্রহ যুগে পরিবার ব্যবস্থা ছিল মাতৃতান্ত্রিক। ইতিহাসে মানব সভ্যতার ক্রমবিবর্তনের ফলে সমাজে কৃষির আবির্ভাব ঘটে ও কৃষি যুগের সূত্রপাত হয়। কৃষি কাজের বিকাশ ও বিস্তারের ফলে উদ্বৃত্ত সম্পদের সৃষ্টি হয়। এ উদ্বৃত্ত সম্পদের মালিকানা ক্রমান্বয়ে চলে আসে পুরুষের হাতে। ফলে পিতৃতান্ত্রিক পরিবার ব্যবস্থার সূচনা হয়। এভাবেই পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের মাধ্যমে পুরুষ শাসিত সমাজের উদ্ভব হয়।

পরিবারের সংজ্ঞা

পরিবার হলো মানুষের সংঘবদ্ধ জীবন যাপনের এক বিশ্বজনীন (Universal) রূপ। পৃথিবীতে মানুষের সমাজ যতদিনের পরিবারের অস্তিত্বও ঠিক ততদিনের। পরিবারের একক কোনো সংজ্ঞা পাওয়া কঠিন। পরিবারের সংজ্ঞা নিয়ে সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে মত পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে পরিবারকে সংজ্ঞায়িত করেছেন।

পরিবারের ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Family' কথাটি এসেছে রোমান 'Famuleas' শব্দ থেকে যার অর্থ 'ভৃত্য বা সেবক'। রোমের আইন ব্যবস্থায় ক্রীতদাস ও উৎপাদক গোষ্ঠী, অন্য ভৃত্যগণ, অভিন্ন বংশ বা বিবাহসূত্রে সম্পর্কিত অন্য সদস্যদের বোঝানোর জন্য 'Famulus' শব্দটি ব্যবহৃত হতো। আবার অনেকে মনে করেন, 'Family' শব্দটি ল্যাটিন 'Familia' শব্দ থেকে এসেছে যার অর্থ 'সেবক'। শব্দের উৎপত্তি নিয়ে যেমন মতভেদ রয়েছে তেমনি সংজ্ঞা নিয়েও মতভেদ থাকাটাই স্বাভাবিক। এখানে বিভিন্ন মতের বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা কয়েকজন সমাজবিজ্ঞানীর মতামত তুলে ধরা হলো–

সমাজবিজ্ঞানী অধ্যাপক ম্যাকাইভার ও পেজ-এর মতে, "Family is a group defined by a sex relationship sufficiently precise and enduring to provide for the procreation and upbrininging of children". অর্থাৎ পরিবার হলো এমন একটি গোষ্ঠী যাকে সুস্পষ্ট জৈবিক সম্পর্কের মাধ্যমে অর্থাৎ সুনির্দিষ্ট করা যায়। এটি সন্তান-সন্ততি জন্মদান ও লালন-পালনের এক স্থায়ী প্রতিষ্ঠান।

পরিবার সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞানী অধ্যাপক নিমকফ (M. F. Nimcoff) বলেন, "Family is more or less durable association of husband and wife with or without children or of a man or women alone, with children". (Nimcoff, Marriage and the Family, 1947, P. 6). অর্থাৎ, পরিবার হলো এমন এক ধরনের স্থায়ী সংঘ, যা স্বামী-স্ত্রী সন্তানসহ কিংবা সন্তান ছাড়া অথবা সন্তান-সন্ততীসহ নারী কিংবা পুরুষের দ্বারা গঠিত।

এন্ডারসন ও পার্কার-এর মতে, "Family is a socially recognised unit of people related to each other by kinship, marital and legal ties". (Anderson and Parker, Society, 1964, P. 160). অর্থাৎ, পরিবার হচ্ছে এমন একটি সামাজিকভাবে স্বীকৃত একক যেখানে সদস্যরা রক্তের বন্ধন, বৈবাহিক ও আইনানুগ সম্পর্কের মাধ্যমে ভূমিকা পালন করে।

বারজেস এবং লক মনে করেন, "Family is a group of persons united by the consisting of a single household: interacting and inter communicating with each other in their respective social roles of husband and wife, mother and father, son and daughter,

brother and sister creating a common culture". (Burgess and Locke, The Family, 1953, P. 81). অর্থাৎ পরিবার হচ্ছে এমন এক ধরনের গোষ্ঠী যেখানে বিবাহ, রক্তের বন্ধন ও দত্তক প্রথার মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যক্তি সংঘবদ্ধ হয় এবং এরা সবাই একসাথে একটি বাড়িতে বসবাস করে। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া ও যোগাযোগ বিদ্যমান। তারা অভিন্ন সংস্কৃতি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে যথাযথ সামাজিক ভূমিকা পালন করে থাকে। তারা স্বামী ও স্ত্রী, মাতা-পিতা, ছেলে-মেয়ে এবং ভাই-বোন হিসেবে পরস্পর মিলেমিশে অন্তরঙ্গ সম্পর্কে আবদ্ধ থাকে।

পরিবারের প্রকারভেদ (Types of Family)

বিভিন্ন উপাদান বা মানদন্ডের ভিত্তিতে পরিবারকে বেশ কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন–

১. পিতৃতান্ত্রিক ও মাতৃতান্ত্রিক পরিবার (Patriarchal and Matriarchal Family),
২. পিতৃবাস, মাতৃবাস ও নয়াবাস পরিবার (Patrilocal, Matrilocal and Neolocal Family),
৩. পিতৃসূত্রীয় এবং মাতৃসূত্রীয় পরিবার (Patrilineal and Matrilineal Family),
৪. ক্ষুদ্র, বর্ধিত ও যৌথ পরিবার (Nuclear, Extended and Joint Family),
৫. এক স্ত্রী বা এক স্বামী, বহু স্ত্রী বিবাহ এবং বহু স্বামী ও দলগত স্বামীভিত্তিক পরিবার (Monogamous Family, Polygamous Family and Polyand and Group Marriage Family
৬ অন্তঃগোত্রীয় এবং বহিঃগোত্রীয় বিবাহ ভিত্তিক পরিবার (Endogamous and Exogamous Family)।

পরিবারের কার্যাবলি (Functions of Family)

প্রতিটি পরিবারেরই কিছু সাধারণ একই ধরনের কার্যাবলি থাকে যা সর্বজনীন ও বিশ্বজনীন। অর্থাৎ পরিবারের কিছু অপরিহার্য কার্যাবলি রয়েছে যার মাধ্যমে পরিবারের সদস্যদের মৌলিক চাহিদা পূরণ হয়। তাই পরিবারে এসব কার্যাবলি অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে এবং একটি পরিবারকে ঘিরেই এসব কাজ আবর্তিত হয় বা পরিবার এসব কাজ সম্পাদন করে। যেমন–

১. জৈবিক কাজ (Biological Function)
২. মনস্তাত্বিক কাজ (Psychological Function)
৩. অর্থনৈতিক কাজ (Economic Function)
৪. শিক্ষামূলক কাজ (Educational Function)
৫. রক্ষণাবেক্ষণ কাজ (Maintenance Function)
৬. বিনোদনমূলক কাজ (Recreational Function)
৭. ধর্মীয় কাজ (Religious Function)
৮. সামাজিক নিয়ন্ত্রণমূলক কাজ (Function of Social Control)
৯. সাংস্কৃতিক কাজ (Cultural Function)
১০. নিরাপত্তামূলক কাজ (Securitical Function)
১১. রাজনৈতিক কাজ (Political Function)
১২. সামাজিকীকরণের কাজ (Function of Socialization)
১৩. সামাজিক মর্যাদা বিষয়ক কাজ (Function Social Status)

পরিবারের এ সমস্ত কার্যাবলির মধ্যে শিক্ষামূলক কাজটিই শিক্ষা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং এই পাঠের প্রধান বিবেচ্য।

শিক্ষার সাধারণ ধারণা (General Concept of Education)

'শিক্ষা' শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো– 'Education' যা ল্যাটিন শব্দ 'Educare' হতে উৎপত্তি বলে ধারণা করা হয় যায় অর্থ লালন-পালন করা। মানব সমাজের মৌলিক কার্যপ্রক্রিয়ার একটি হলো শিক্ষা। গ্রীক দার্শনিকদের কাছে শিক্ষা হলো এমন এক সুশৃঙ্খল ও সচেতন পদ্ধতি যা শিশুর সার্বিক বিকাশ সাধনের সাথে যুক্ত। সংকীর্ণ ও ব্যাপক দুই অর্থেই শিক্ষাকে বোঝানো হয়। সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষা বলতে কেবল আনুষ্ঠানিক শিক্ষাকেই বোঝায়। যা নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ে, নির্দিষ্ট ও সুশৃঙ্খল প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীকে শিক্ষণ বা পাঠদান করা। আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় শিখন শেখানো কার্যাবলিই মুখ্য বিষয়। তবে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কেবল পাঠদানই নয় এর সাথে মানসকে বিকশিত করে তোলা, সাফল্যের সঙ্গে তাকে বর্তমান ও ভবিষ্যতের উপযোগী করে গড়ে তোলা। অনুশীলনের মাধ্যমে আচরণের ইতিবাচক ও স্থায়ী পরিবর্তন সাধন করা। প্রকৃতপক্ষে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বলতে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাকেই বোঝায়। শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে নির্দিষ্ট শিক্ষাক্রম অনুযায়ী লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যভিত্তিক পঠন-পাঠন, মূল্যায়ন পরিচালিত হয় আনুষ্ঠানিক শিক্ষায়।

ব্যাপক অর্থে শিক্ষা হলো মানুষের জীবনব্যাপী চলমান একটি প্রক্রিয়া। জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি এ প্রক্রিয়া চলমান থাকে। এ জাতীয় শিক্ষা কোনো সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের বিষয় নয়। এটি সমাজের মানুষের সামগ্রিক জীবন ধারার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। অধ্যাপক ম্যাকেঞ্জি (Mackenzie)-এর মতে, ব্যাপক অর্থে শিক্ষা বলতে মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন বা আত্মোপলব্ধিকেই বোঝায়। তাঁর মতে, এই অর্থে শিক্ষা এক বিরামহীন প্রক্রিয়া যা আমৃত্যু অব্যাহত থাকে। মানুষের জীবনাপথে অর্জিত বহু অভিজ্ঞতার প্রতিটিই কোনো না কোনো শিক্ষালাভে সহায়তা করে। এ ধরনের শিক্ষা গ্রহণ প্রাত্যহিক জীবনের অভিজ্ঞতা অর্জনের মাধ্যমে নিরন্তর চলতে থাকে। ফলে এ ধরনের শিক্ষা হলো একটি সাধারণ প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে প্রতিনিয়ত মানুষ শিক্ষা অর্জন করে। যাকে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা বলা হয়। ব্যাপক অর্থে শিক্ষা মানেই জীবন আর জীবনই শিক্ষা।

শিক্ষার সংজ্ঞা (Definition of Education)

বিভিন্ন মনিষী বিভিন্নভাবে শিক্ষাকে সংজ্ঞায়িত করেছেন যার মধ্যে কিছু সংজ্ঞা এই পাঠটিতে দেয়া হলো–

প্লেটো মনে করেন, "শিক্ষা হচ্ছে সঠিক মুহূর্তে আনন্দ ও বেদনা অনুভব করতে পারার ক্ষমতা বা শক্তি"। (Education is the capacity to feel pleasure and pain in the right moment.)

এরিস্টটল-এর মতে, "সুস্থ দেহে সুস্থ মন তৈরি করার নামই শিক্ষা।" Education is the creation of sound mind in a sound body.)

জোহান হেনরিক পেস্তানলৎসী বলেন, "শিক্ষা হলো মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তিসমূহের স্বাভাবিক, সুষম ও প্রগতিশীল বিকাশ"। (Education is natural, harmonious and progressive development of man's innate power.)

হোয়াইটহেড (Whitehead) বলেন, "শিক্ষার একমাত্র বিষয় হলো সর্বতোভাবে বিকশিত বা প্রকাশিত জীবন"।

এন্ডারসন ও পার্কার এর মতে, "শিক্ষা হচ্ছে একটি সামাজিক প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি সমাজ জীবনে উপযুক্ত হয়ে উঠতে পারে"। (Education is the social process by which an individual learns the things necessary to fit him to the life of his society.)

পরিবার ও শিক্ষা (Family and Education)

শিক্ষার সাথে পরিবারের সম্পর্ক কিংবা পরিবারের সাথে শিক্ষার সম্পর্ক অত্যন্ত নিগুঢ় এবং একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল। মানব সভ্যতার প্রাথমিক পর্যায়ে, এমন কি প্রাক-আধুনিক যুগেও মানুষের শিক্ষা গ্রহণের প্রধান ও একমাস মাধ্যম বা প্রতিষ্ঠান ছিল পরিবার। আধুনিক সমাজ ও পাশ্চাত্য পুঁজিবাদী সমাজে শিক্ষা এক বিশেষ ধরনের সামাজিক কর্মকান্ড হিসেবে বিকাশ লাভ করে। আধুনি সমাজে শিক্ষা বলতে প্রধানত 'আনুষ্ঠানিক শিক্ষাকেই (Formal Education) বুঝায়। কিন্তু শিক্ষা বিষয়টি আরো ব্যাপক ও বিস্তৃত। শিক্ষা একটি জীবনব্যাপী সামাজিক প্রক্রিয়া। কখনো পরিবারের গন্ডিতে, কখনো পরিবারের বাইরের কোনো প্রতিষ্ঠানে, কখনো বা উন্মুক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশের আবহে। তবে শিক্ষার শুরুটা হয় মানুষের জন্মের পর থেকে পরিবারের পরিমন্ডলে। অনুষ্ঠানিক শিক্ষার বাইরে এ ধরনের জীবনব্যাপী উন্মুক্ত উদার শিক্ষাকে 'অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা (Informal Education) বলা হয় যা মানুষ দেখে, ঠেকে কিংবা শুনে বা বুঝে শেখে।

মানব সভ্যতার প্রাথমিক পর্যায়ে সহজ-সরল সমাজে শিক্ষা একটি পৃথক সামাজিক কর্মকান্ড হিসেবে গণ্য হয়নি। কারণ মানুষের কর্মজীবনে তখনো কোনো পৃথকীকরণ ঘটেনি। সমাজের ওই পর্যায়ে তখন পরিবারের ভাই-বোন ও জ্ঞাতিগোষ্ঠীর বয়োজ্যেষ্ঠ কোনো ব্যক্তির মাধ্যমে সামাজিক মূল্যবোধ শিক্ষা দেয়া হতো এবং সঞ্চারিত হতো। তখন মানুষ তাদের দৈনন্দিন জীবনের কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের মাধ্যমেই গোষ্ঠীর লোকরীতিগুলো আয়ত্ত করতো। আধুনিক সমাজে এখনো মানুষ পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠদের কাছ থেকেই পারিবারিক ও সামাজিক মূল্যবোধ, রীতিনীতি, অনুশাসন, লোক-প্রথা, কাজকর্ম ইত্যাদি শিখে থাকে। তবে মানব সভ্যতার প্রাথমিক পর্যায়ে যে সব আদিম সমাজ কিছুটা উন্নত পর্যায়ে পৌঁছেছিল সে সব সমাজে যৌবনের প্রারম্ভেই আনুষ্ঠানিক শিক্ষাদান শুরু হতো। লোঈ (Lowie) তাঁর Social organization (1948) নামক গ্রন্থে 'ইয়াগানদের' (Yaghan) সমাজে প্রচলিত এ ধরনের আনুষ্ঠানিক শিক্ষার বর্ণনা দিয়েছেন। উক্ত সমাজে প্রত্যেক ছেলে কিংবা মেয়ে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের মাধ্যমেই লেখাপড়া শিখতো। তারা তাদের চরিত্রের দোষ-ত্রুটি ধরিয়ে দিতেন এবং সে সব সংশোধনের ব্যবস্থাও করতেন এরই ধারাবাহিকতায় মানব সমাজে বৃত্তিমূলক (Vocational) শিক্ষার সুত্রপাত ঘটে। মূলত তখনকার সমাজে পরিবারের গন্ডীতেই ছেলে মেয়েরা বাস্তব জীবনে পর্যবেক্ষণ ও প্রত্যক্ষ যোগাযোগের মাধ্যমে পরিবারের সদস্যদের দ্বারা বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয় কলাকৌশল আয়ত্ত করতো। যদিও বর্তমান যুগে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য বহুবিধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে মানব সমাজে তবুও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার দায়িত্ব প্রধানত এখনো পরিবারের ওপরই নির্ভরশীল। উন্নয়নশীল দেশসহ বিশ্বের অধিকাংশ দেশেই শিশুর শিক্ষার হাতেখড়ি হয় পরিবারেই। পরিবারের পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া ব্যক্তির আনুষ্ঠানিক শিক্ষা এমনক উচ্চ শিক্ষাও সম্ভব না।

যে কোনো শিক্ষিত মানুষের শিক্ষার পটভূমিতে তার পরিবারের অবদান অনস্বীকার্য। বিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য পরিবারই শিশুকে প্রস্তুত করে দেয়। এছাড়াও ব্যক্তির সামাজিক শিক্ষা বা সামাজিকীকরণ, সংস্কৃতিকরণ, ধর্মীয় শিক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিবারই মূখ্য ভূমিকা পালন করে। অতএব বলা যায়, সব ধরনের শিক্ষার সূচনাই হয় পরিবার থেকে এবং প্রতিনিয়ত শিক্ষার সংস্কারও হস্তান্তরও চলে এই পরিবারের মাধ্যমেই।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.২

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. পরিবার সমাজ কাঠামোর–
ক. মৌল অঙ্গ সংগঠন
খ. যৌথ সংগঠন
গ. একক সংগঠন
ঘ. সমন্বিত মৌল সংগঠন

২. পরিবার আসলে কোন ধরনের প্রতিষ্ঠান?
ক. বিনোদনমূলক প্রতিষ্ঠান
খ. শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান
গ. রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান
ঘ. সামাজিক প্রতিষ্ঠান

৩. Family শব্দটির উৎপত্তি কোন শব্দ থেকে?
ক. ল্যাটিন শব্দ Familia থেকে
খ. রোমান শব্দ Famuleas থেকে
গ. দু'টোই সঠিক
ঘ. কোনটিই নয়

উত্তরমালা: ১. ক, ২. ঘ, ৩. গ

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. পরিবার কী?
২. পরিবারের মার্কসীয় ধারণা কী?
৩. পরিবারের অর্থে শিক্ষা বলতে কী বোঝায়?
৪. শিক্ষার পাঁচটি সংজ্ঞা দিন।

খ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. পরিবারের সাধারণ ধারণা ও মাকর্সীয় ধারণা সম্পর্কে আলোচনা করুন।
২. পরিবারের কার্যাবলিগুলো বর্ণনা করুন।
৩. শিক্ষার সাধারণ ধারণা বলতে কী বোঝানো হয়? পরিবার ও শিক্ষার সম্পর্ক এবং শিক্ষায় পরিবারের ভূমিকা ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ ৬.৩: জেন্ডার ও শিক্ষা
Gender and Education

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- জেন্ডারের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- জেন্ডার সংশ্লিষ্ট কয়েকটি পদ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- জেন্ডার বৈষম্যের কারণগুলো উল্লেখ করতে পারবেন।
- জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণে শিক্ষার ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে জেন্ডার বৈষম্যের স্বরূপ নির্ণয় করতে পারবেন।

জেন্ডার

সাধারণভাবে বা সঙ্কীর্ণ অর্থে জেন্ডার শব্দের অর্থ বলতে অনেকে লিঙ্গ (Sex)-কে বুঝে থাকেন। প্রকৃত অর্থে শব্দ দুটির অর্থ আলাদা। জেন্ডার কী সে সম্পর্কে জানতে হলে Sex-এর সাথে এর পার্থক্য বুঝতে হবে। সাধারণভাবে সেক্স বলতে একজন মানুষের জন্মগতভাবে নির্ধারিত জৈবিক অবস্থা (নারী বা পুরুষ) বা শারীরিক গঠনগত পার্থক্যকে বুঝায়। অন্যদিকে জেন্ডার বলতে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে একটি সমাজের নারী-পুরুষের প্রত্যাশিত ভূমিকা ও আচরণকে বুঝায়। অর্থাৎ সমাজে একজন নারী-পুরুষ অথবা ছেলে/মেয়ে কী করবে, কী করতে পারবে না সমাজ কর্তৃক তা নির্ধারণ করে দেওয়াই হচ্ছে জেন্ডার। ঐতিহাসিকভাবে নারী ও পুরুষের মধ্যে কাজ এবং ক্ষমতার বিভাজন বা সম্পর্কের ভিত্তিতে জেন্ডারের ধারণা সৃষ্টি হয়েছে, যা পুরুষ নারীর তুলনায় উত্তম এ ধারণাটি সমাজে প্রতিষ্ঠিত করেছে। জেন্ডারের ধারণা মানুষের সৃষ্ট, অন্যদিকে সেক্স হচ্ছে প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট মানুষের জৈবিক বেশিষ্ট্য। অতএব জেন্ডারের সাথে সেক্স এর সরাসরি কোন সম্পর্ক নেই। Gender refers to the socially determined ideas and practices of what it is tube male or male.

জেন্ডার সম্পর্কিত কয়েকটি পদ

জেন্ডার সমতা (Gender Equality)

নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের মধ্যে সম্পদের অধিকার ও সুযোগ-সুবিধার সমবন্টনকে বলা হয় জেন্ডার সমতা। আর যখন এক্ষেত্রে বৈষম্য করা হয় তাকে বলে জেন্ডার অসমতা। নারীর বিরুদ্ধে এ ধরনের অসমতা বিশ্বের সকল সমাজে কম-বেশি লক্ষ্য করা যায়। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় বিদ্যমান বৈষম মূলক সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী অসমতার মুল কারণ।

জেন্ডার সাম্যতা (Gender Equity)

এটি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিগত ব্যাপার। এ মূল কথা হচ্ছে নারী-পুরুষ তথা লিঙ্গ নির্বিশেষে সকলের চাহিদাকে সমানভাবে উপলব্ধি করা এবং সে অনুযায়ী সমাজের সকল ক্ষেত্রে নারী পুরুষ উভয়কে সমান মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা প্রদানের মনোভাব। জেন্ডার সাম্য জেন্ডার সমতা সৃষ্টিতে অবদান রাখে। অন্যদিকে জেন্ডার অসাম্য সমাজে অসমতার বীজ বপন করে।

জেন্ডার বিশ্লেষণ (Gender Analysis)

জেন্ডার বিশ্লেষণ বলতে কোন সমাজ ও প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে লিঙ্গভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করাকে বুঝায়। সমাজে নারী ও পুরুষের প্রত্যাশিত ভূমিকা আছে। এই ভূমিকাই নারী পুরুষের পছন্দ অপছন্দ, অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানার্জন, চাহিদা, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা, সম্পদের অধিকার ও নিয়ন্ত্রণ লাভ ইত্যাদিকে প্রভাবিত করে। কিন্তু জেন্ডার ভূমিকার অসম নিয়ন্ত্রণের কারণে নারী, পুরুষ যে কেউই বিভিন্ন সুবিধা থেকে বঞ্চিত হতে পারে যা তাদের উন্নয়নের গতিরোধ করতে পারে। জেন্ডার বিশ্লেষণের মাধ্যমে এ বৈষম্য সম্পর্কে জানা যায়। ফলে নারী-পুরুষ, ছেলে-মেয়ে সকলের চাহিদা পূরণে সঠিক নীতিমালা, কর্মসূচি ও প্রকল্প গ্রহণ করা সম্ভব হয়।

জেন্ডার লেন্স (Gender Lens)

এটি এমন একটি হাতিয়ার যার মাধ্যমে পুরুষের পাশাপাশি নারীর চাহিদা, অংশগ্রহণ ও বাস্তব অবস্থাকে সূক্ষ্মভাবে অনুসন্ধান ও পর্যালোচনার মাধ্যমে তাদের প্রকৃত অবস্থা জানা যায়। চেকলিস্ট, জরিপ বা অন্য যে কোন প্রক্রিয়ায় তা করা যায়।

মূলধারায় জেন্ডার অন্তর্ভুক্তকরণ (Gender Mainstreaming)

মূলধারার নীতি নির্ধারণী সংস্থা ও ব্যবস্থায় জেণ্ডার বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা এবং প্রতিষ্ঠানের কর্মসূচি এবং কাঠামোতে নারী উন্নয়ন ও তাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করা, প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের মধ্যে বিদ্যমান জেণ্ডার সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা, সচেতনতা সৃষ্টি এবং প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকাণ্ডে জেণ্ডার সমতা রক্ষাই হচ্ছে মূলধারায় জেন্ডার অন্তর্ভুক্তকরণ।

জেন্ডার ভূমিকা (Gender Role)

নারী-পুরুষের আচরণ, দৃষ্টিভঙ্গি ও কাজ সম্পর্কে সমাজের প্রত্যাশা।

জেন্ডার বৈষম্যের কারণ ও ফলাফল (Cause and Effect of Gender Dissimilation)

যখন লিঙ্গগত পার্থক্যের কারণে নারী ও পুরুষের প্রতি সামাজিক আচরণের ক্ষেত্রে পার্থক্য করা হয়, তখনই জেন্ডার বৈষম্য সৃষ্টি হয়। সমাজের পুরুষ ও নারীর মধ্যে দীর্ঘদিনের বিরাজমান জেন্ডার অসমতাই হচ্ছে জেন্ডার বৈষম্যের ভিত্তি। পুরুষদের প্রতি বেশি Favoritism এবং নারীদের প্রতি অসম আচরণ এ বৈষম্যের ভিত্তি। গতানুগতিক মূল্যবোধ, সাক্ষরতার নিম্নহার ও নিম্নমানের শিক্ষা, সচেতনতার অভাব, যথাযথ নির্দেশনার অভাব, পারিবারিক দায়িত্বের বোঝা ইত্যাদি বহুবিধ কারণ এ ধরনের অসম আচরণ সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে। এসব কারণগুলোকে বিশ্লেষণ করলে জেন্ডার বৈষ্যমের কারণগুলোকে নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করা যায়–

১. সংস্কার
২. জৈবিক
৩. সামাজিক ও সাংস্কৃতিক
৪. অর্থনৈতিক
৫. শিক্ষাগত
৬. ব্যক্তিগত ও মনস্তত্ত্বাত্বিক
৭. গতানুগতিক জেন্ডার ভূমিকা

জেন্ডার বৈষম্যের ফলাফল ঘরে ও বাইরে প্রতিনিয়ত প্রকাশ পায়। যেমন, নারী নিরক্ষর বা কম শিক্ষিত হলে অল্প বয়সে বিয়ে হয়, অধিক সন্তান জন্মদান করে। সন্তানদের যথাযথ শিক্ষায় শিক্ষিত করতে পারেনা, স্বাস্থ্যহীনতা ও পুষ্ঠিহীনতায় ভোগে, সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে সচেতন হতে পারে না। নতুন প্রযুক্তিগত জ্ঞানের অভাব হয়। ফলে নতুন ও আধুনিক উৎপাদনমূলক কর্মকাণ্ডে বা কাজকর্মে সংশ্লিষ্ট হতে পারে না। নির্যাতনের স্বীকার হয় এবং প্রয়োজনীয় জ্ঞানের অভাবে প্রতিবাদ করা বা আইনগত সুবিধা গ্রহণ করতে পারে না।

জেন্ডার বৈষম্য ও শিক্ষার সম্পর্ক

জেন্ডার বৈষম্যের কারণগুলোর মধ্যে শিক্ষা অন্যতম। পুরুষের তুলনায় নারীর অধিক নিরক্ষরতা ও নিম্নমানের শিক্ষার কারণে সে আরও নানা ধরনের বৈষম্যের মুখোমুখি স্বীকার হয়। যেমন–

- নিরক্ষর ও অশিক্ষিত নারীদের জ্ঞানের অভাব থাকায় তাদের ক্ষমতায়ন হয় না। জীবনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা, সমস্যা দূরীভূত ও বৈষম্য থেকে মুক্তি পেতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন নারীর শিক্ষা।
- নারীর ক্ষমতায়নের অভাব তার আত্মনির্ভরশীলতার প্রধান প্রতিবন্ধকতা। শিক্ষা ব্যক্তিকে আত্মনির্ভরশীল হতে সাহায্য। এ জন্য তাদের শিক্ষিত হতে হবে।
- নারীর উন্নয়ন মানেই হচ্ছে তার রাজনৈতিক আর্থিক ও পেশাগত অবস্থার উন্নয়ন ও আইনগত সচেতনতা ইত্যাদি যা শিক্ষার মাধ্যমেই অর্জন করা সম্ভব।
- নারীর সার্বিক অবস্থার উন্নয়নের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হচ্ছে শিক্ষা। মহাত্মা গান্ধী বলেছেন একজন পুরুষ যদি শিক্ষিত হয় তাহলে কেবল একজন ব্যক্তি শিক্ষিত হয়। কিন্তু একজন নারী শিক্ষিত হলে গোটা পরিবার শিক্ষিত হয়। এছাড়া আমাদের নারী সমাজের অনেকেই সামাজিক বাধা নিষেধের কারণে যথাযথ শিক্ষা পায় না, ফলে তাদের, পেশাগত ও ব্যক্তিত্বের যথাযথ বিকাশ সম্ভব হয় না, তাই তারা বৈষম্যের শিকার হয়।

শিক্ষা নারীকে বৈষম্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার শক্তি যোগায়। তাই বাংলাদেশের সংবিধান, জাতীয় শিক্ষানীতিসহ সর্বত্র শিক্ষাক্ষেত্রে নারী পুরুষের বৈষম্য দূর করার উপরে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণে শিক্ষাক্ষেত্রে নানা পদক্ষেপ (সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা, ছাত্রী বৃত্তি চালুকরণ, প্রাথমিক স্তরে ৫০% মহিলা শিক্ষক নিয়োগ ইত্যাদি) গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে দৃশ্যমান অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। শিক্ষার মাধ্যমে নারী যদি তার শিক্ষার অধিকার সঠিকভাবে চর্চা করতে পারে তবে সমাজ থেকে জেন্ডার বৈষম্য নির্মূল করা সম্ভব হবে। শিক্ষাই পারে সমাজের সদস্যদের গতানুগতিক মনোভাব ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিশ্বাস থেকে বের করে এনে একটি সাম্য ও সমতাভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা গড়তে।

নারী শিক্ষার স্বরূপ (Nature of Woman Education)

১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জনের সময় বাংলাদেশের নারী সাক্ষরতা হার ছিল মাত্র ১১%। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষায় অবস্থা ছিল আরও করুণ। ১৯৭২ সালে প্রণীত বাংলাদেশের সংবিধান নারী-পুরুষ উভয়ের শিক্ষার সমান অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে। এরই ফলশ্রুতিতে সরকার দেশের শিক্ষা পরিস্থিতির উন্নয়নসহ নারী শিক্ষার উন্নয়নে নানা ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যার ফলশ্রুতিতে নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। বর্তমানে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় ক্ষেত্রেই জেন্ডার বৈষম্য দূরীভূত হয়েছে। শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রেও সমতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে মেয়েদের অংশগ্রহণ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। যদিও টেকনিক্যাল ও ভোকেশনাল পেশায় নারীরা এখনও পিছিয়ে আছে। বাংলাদেশের নারীরা তাদের শিক্ষার অধিকার সম্পর্কে বর্তমানে অনেক বেশি সচেতন। তা সত্ত্বেও সমাজের অনেক ক্ষেত্রেই নানা কারণে নারী শিক্ষা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এ বাধা দূরীকণের দায়িত্ব আমাদের সকলের।

নারী শিক্ষার প্রতিবন্ধকতা ও দূরীকরণের উপায়

নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রধান কয়েকটি প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে– গতানুগতিক সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি, শিক্ষার সুযোগ গ্রহণের ব্যয় (Opportunity Cost), সামাজিক নিরাপত্তার অভাব, বিদ্যালয়ের দূরত্ব, শিক্ষাক্রমে নারীর চাহিদা ও প্রয়োজন যথাযথভাবে প্রতিফলিত না হওয়া ইত্যাদি। নিম্নোক্ত উপায়ে প্রতিবন্ধকতাগুলো দূর করা যেতে পারে–

- সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি।
- নারী শিক্ষার্থীর চাহিদাভিত্তিক বিদ্যালয় কর্মসূচি প্রণয়ন।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধিক সংখ্যক নারী শিক্ষক নিয়োগ।
- নারী শিক্ষার উন্নয়নের জন্য ব্যয় বৃদ্ধি।
- সমাজের কাছাকাছি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং বিদ্যালয় কর্মকাণ্ডে সমাজ ও অভিভাবকের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি।
- প্রাসঙ্গিক শিক্ষাক্রম প্রণয়ন।
- যাতায়াত ও হোস্টেলের ব্যবস্থাকরণ।
- শিক্ষকদের জেন্ডার বৈষম্য বিষয়ে সচেতনতার জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একাডেমিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণে জেন্ডার বিষয়টিকে গুরুত্ব প্রদান।
- নারী শিক্ষার্থীদের জন্য বিদ্যালয়ে শিক্ষার যথাযথ পরিবেশ সৃষ্টি।
- সর্বোপরি শিক্ষাক্রমে জেন্ডার বিষয়টি যথাযথ সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের নারী-পুরুষের বৈষম্যের বিভিন্ন দিক ও সেগুলো দূরীকরণের উপায় সম্পর্কে অবহিত করে শিক্ষাক্ষেত্রে নারী-পুরুষের বৈষম্য দূরীকরণ করা যেতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৩

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে সমাজে নারী ও পুরুষের প্রত্যাশিত ভূমিকাকে কী বলে?
ক. লিঙ্গ
খ. জেন্ডার
গ. জেন্ডার সমতা
ঘ. জেন্ডার সাম্য

২. সমাজে নারী ও পুরুষের মধ্যে অসমতার কারণ কোনটি?
ক. জেন্ডার অসাম্য
খ. জেন্ডার সমতা
গ. জেন্ডার অসচেতনতা
ঘ. জেন্ডার সাম্য

৩. বাংলাদেশের মেয়েরা কোন ক্ষেত্রে এখনও পিছিয়ে আছে?
ক. প্রাথমিক শিক্ষা
খ. মাধ্যমিক শিক্ষা
গ. টেকনিক্যাল শিক্ষা
ঘ. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা

উত্তরমালা: ১. খ, ২. ক, ৩. গ

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. জেন্ডার বলতে কী বুঝায়?
২. জেন্ডার সমতা ও জেন্ডার সাম্যের মধ্যে পার্থক্য কী?
৩. জেন্ডার বিশ্লেষণ কীভাবে জেন্ডার অসমতা দূর করতে পারে?
৪. মূলধারায় জেন্ডার অন্তর্ভুক্তকরণ বলতে কী বুঝায়। এর প্রয়োজয়ীতা কী?

খ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. জেন্ডার অসমতার কারণে সমাজ কীভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় ব্যাখ্যা করুন?
২. বাংলাদেশের নারী শিক্ষার বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ করুন।
৩. নারী শিক্ষার প্রতিবন্ধকতাও তা দূরীকরণের উপায় বর্ণনা করুন।

পাঠ ৬.৪: শিক্ষার জনমিতিক উপাদান
Demographic Factors of Education

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- নৈমিত্তিক ধারণা উল্লেখ করতে পারবেন।
- শিক্ষায় জনমিতিক উপাদানের ধারণা ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- শিক্ষা ও জনমিতিক উপাদানের পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে জনমিতিক উপাদানের প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

জনমিতির ধারণা

সাধারণ অর্থে কোন দেশ বা অঞ্চলের জনগণের আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্যের (যেমন– বয়স, লিঙ্গ, শিক্ষা, আয় ব্যয়, বৈবাহিক অবস্থা, ধর্ম, জন্মহার, মৃত্যুহার, পরিবারের আকার, বিয়ের বয়স ইত্যাদি) পরিসংখ্যানিক উপস্থাপনকে জনমিতি বলা হয়। সাধারণত আদমশুমারীর মাধ্যমে এসকল তথ্য ও উপাত্ত সংগৃহীত হয়। কোন প্রতিষ্ঠান বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেরও নিজস্ব জনমিতিক বৈশিষ্ট্য থাকে যা তার কাজ ও উৎপাদনকে (Output)-কে প্রভাবিত করে।

শিক্ষায় জনমিতিক উপাদানের গুরুত্ব

শিক্ষা মৌলিক মানবাধিকার। মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার (১৯৪০) ২৬ নং অনুচ্ছেদে এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তির স্বাস্থ্য, স্বাধীনতা, নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক কল্যাণ এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের সক্ষমতা বাড়ায়। কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর শিক্ষার প্রভাব ইতিবাচক। এটি জন্মহার ও মৃত্যুর হার কমায়, এইচআইভি/এইডস ও অন্যান্য সংক্রামক রোগ সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ায়, বেঁচে থাকার সম্ভাবনা বাড়ায়। শিক্ষা সামাজিক-অর্থনৈতিক বাঁধা দূরীকরণের শক্তিশালী হাতিয়ার। অতএব, শিক্ষার সম্প্রসারণ (গুণগত ও পরিমাণগত) অত্যন্ত জরুরি।

কোন দেশের শিক্ষার উন্নয়ন ঐ দেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক দিকের উপর নির্ভরশীল। এছাড়াও একটি দেশের শিক্ষা ঐ দেশের জনমিতিক উপাদানের দ্বারা বহুলাংশে প্রভাবিত এবং রূপান্তরিত হয়। শিক্ষার মানের উপরও জনমিতিক বৈশিষ্ট্যের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব রয়েছে।

শিক্ষা ও জনমিতিক উপাদানের পারস্পরিক সম্পর্ক

শিক্ষা ও জনমিতির সম্পর্ক দ্বিমুখী। জনমিতিক উপাদানগুলো একদিকে যেমন শিক্ষার রূপরেখা প্রণয়নের সাহায্য করে তেমনি শিক্ষা জনমিতিতে পরিবর্তন আনয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। নিচে পারস্পরিক সম্পর্কের দুটি দিক নিয়ে আলোচনা করা হল।

শিক্ষার সাথে জনমিতির বৈশিষ্ট্যের দ্বিমুখী সম্পর্ককে নিম্নোক্তভাবে প্রকাশ করা যায়।

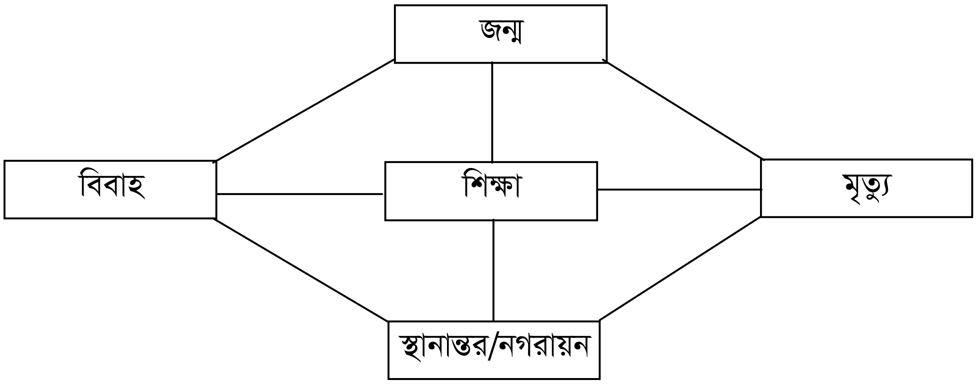

জন্ম ও মৃত্যু একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এর দুটি অন্যতম জনমিতিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে জন্মহার ও মৃত্যুহার। জন্মহার কোন দেশের শিক্ষার অন্যতম প্রভাবক। এছাড়া নাগরিকদের বৈবাহিক অবস্থা, স্থানান্তর, নগরায়ন প্রক্রিয়াও শিক্ষাকে প্রভাবিত করে। আবার কোন দেশের শিক্ষার পরিবর্তনের সাথে সাথে জনমিতিক বৈশিষ্ট্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিবর্তন আসে। নিচে শিক্ষা ও জনমিতির এ দ্বিমুখী সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তার আগে জেনে নিই জনমিতির এ উপাদানগুলো দিয়ে কী বুঝায়।

জন্ম হার– একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোন দেশ বা অঞ্চলের জন্মের প্রকৃত সংখ্যা।
মৃত্যু হার- একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোন দেশ বা অঞ্চলের জনগণের মৃত্যু সংখ্যা।
স্থানান্তর– কোন দেশ বা অঞ্চল থেকে জনগণ অন্য দেশ বা অঞ্চলে বসবাসের অভিপ্রায়ে গমন করলে তাকে স্থানান্তর বলে।
নগরায়ন- জনগণ যখন গ্রামাঞ্চল থেকে বসবাসের উদ্দেশ্যে শহরে আসে তাকে বলে শহরায়ন বা নগরায়ন।

শিক্ষায় জনমিতির প্রভাব

১. **জনমিতি ও শিক্ষা পরিচালনা:** কোন দেশের জনগণের জন্য শিক্ষা পরিকল্পনা করার ক্ষেত্রে জনগণের বয়সের কাঠামো ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মূলত জনগণের জনমিতিক বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করেই শিক্ষা পরিকল্পনা করা হয়। কোন জনসংখ্যার বয়স কাঠামোর ভিত্তিতে শিক্ষার চাহিদা, বিদ্যালয় সংখ্যা ও বিভিন্ন বয়সের উপযোগী শিক্ষার্থী সংখ্যা নির্ধারণ করা হয় এবং সে অনুযায়ী শিক্ষার সম্ভাব্য চাহিদা নির্ধারণ করা হয় যা কোন শিক্ষানীতির প্রারম্ভিক সূচনা পয়েন্ট হিসেবে কাজ করে।

২. **স্কুল ম্যাপিং এবং শিক্ষা:** জন্ম হার, জনসংখ্যা ঘনত্ব, ভৌগোলিক অবস্থান ইত্যাদি শিক্ষার বিভিন্ন চাহিদা নির্ধারণে সাহায্য করে। কোন স্থানের/অঞ্চলের জনসংখ্যার ঘনত্ব ও অবস্থান, স্থানান্তর-এর ধারা ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে শিক্ষার ব্যয়, স্কুলের ধরন, আকার, অবস্থান ইত্যাদি বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

৩. **জনমিতি ও শ্রম চাহিদা:** কোন দেশের কর্মজীবি মানুষের পেশা/অর্থনৈতিক কর্মধারা, শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী সে দেশের শ্রম চাহিদা পরিমাপ করা হয় এবং সে অনুযায়ী কারিগরি, বৃত্তিমূলক এবং উচ্চ শিক্ষার চাহিদা ও লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়।

৪. **জন্মহার ও শিক্ষার সম্প্রসারণ ও সংকুচিতকরণ:** যে কোন দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতিধারা প্রধানত জন্মহার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তাই জন্মহার শিক্ষা পরিকল্পনার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কোন দেশের ভবিষ্যৎ জন্মহারের উপর ভিত্তি করেই প্রতিবছর কোন শ্রেণিতে কতজন শিক্ষার্থীকে ভর্তি করতে হবে তা নির্ধারণ করা হয় এবং সে অনুযায়ী একটি দেশের শিক্ষার অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধাগুলো সৃষ্টি করা হয়। একই ভাবে জন্মহার হ্রাসের কারণে বা স্থানান্তরের কারণে শিক্ষার্থী সংখ্যা কমে গেলে অথবা শিক্ষাকে সংকুচিত করার প্রয়োজন

দেখা দেয়। ফলে সে অনুযায়ী নীতি প্রণয়ন বা পরিবর্তনের প্রয়োজন হতে পারে। তবে মনে রাখতে হবে, জনমিতিক উপাদান শিক্ষার একমাত্র প্রভাবক নয়। শিক্ষার সাফল্য, ব্যর্থতা, লক্ষ্য অর্জন আরও অনেক উপাদানের উপর নির্ভরশীল (অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি)।

জনমিতিক বৈশিষ্ট্যের উপর শিক্ষার প্রভাব

১. **শিক্ষা ও মৃত্যুহার:** মৃত্যু হারের উপর শিক্ষার যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। জনগণ শিক্ষিত হলে বেঁচে থাকার সম্ভাবনা বা গড় আয়ু বাড়ে, স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা বৃদ্ধি পায়। ফলে মৃত্যুহার কমে আসে।

২. **শিক্ষা ও বিয়ের বয়স:** শিক্ষা ও বিয়ের মধ্যে ইতিবাচক সম্পর্ক রয়েছে। শিক্ষিত লোক সাধারণত অশিক্ষিত বা স্বল্পশিক্ষিত লোকের চাইতে দেরীতে বিয়ে করে। ফলে পরিবারে সন্তানের সংখ্যা তুলনামূলক কম হয়।

৩. **শিক্ষা ও স্থানান্তর:** শিক্ষা সমাপ্তির পর্যায় স্থানান্তরের ধরনকে প্রভাবিত করে। শিক্ষিত লোকজনের মধ্যে শহরে বা বিদেশে যাওয়ার প্রবণতা বেশি থাকে। অনেক সময় শিক্ষার সুযোগ-সুবিধার পার্থক্যেও কারণেও লোকজন গ্রাম থেকে শহরে স্থানান্তরিত হয়।

৪. **শিক্ষা ও পরিবারের আকার:** শিক্ষিত মেয়েদের পরিনত বয়সে বিয়ে হওয়ায় তারা জন্মদান সন্তান ধারণ করে। ফলে অশিক্ষিত ও অল্প শিক্ষিতদের তুলনায় তারা কম সংখ্যক সন্তান জন্মদান করে যা তাদের পরিবারের আকার ছোট রাখতে সাহায্য করে।

৫. **শিক্ষা ও জন্মহার:** শিক্ষার সাথে জন্মহারের নেতিবাচক সম্পর্ক রয়েছে। লোকজন বেশি শিক্ষিত হলে কেবল বিয়ের বয়সই বৃদ্ধি পায় না, সেই সাথে তাদের দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিবর্তন ঘটে। ফলে শিক্ষিত লোক ছোট পরিবার পছন্দ করে। এতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি কমে আসে।

৬. **শিক্ষা ও জীবনযাত্রার মান:** শিক্ষিতরা চাকুরি/কাজ করে আত্মনির্ভরশীল হওয়ায় মানসিকতা অর্জন করে। তারা স্বাধীনতা ও ইচ্ছা পূরণে সন্তানের লেখাপড়ার খরচ ও তার মান সম্পর্কে তুলনামূলকভাবে সচেতন থাকে। এছাড়া তাদের সামাজিক অবস্থান, জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সম্পর্কিত জ্ঞান তাদের সন্তান জন্মদানকে যৌক্তিক উপায়ে নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে।

সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে জনমিতির ভূমিকা

জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বিশেষত জন্মহার শিক্ষার চাহিদাকে প্রভাবিত করে। এর উপর নির্ভর করে প্রতিবছর কত সংখ্যক শিক্ষার্থী স্কুলে ভর্তি হবে। জন্মহার বেশি থাকলে ভর্তির সংখ্যা বাড়ে। ফলে বাজেট ঘাটতি হতে পারে যার কারণে শিক্ষার প্রয়োজনীয় উপাদানগুলোর যোগান দেওয়া সম্ভব হয় না। ফলে সর্বজনীন শিক্ষার সংখ্যার্জন ও গুণগতমান ব্যাহত হয়। এছাড়া জনমিতির মাধ্যমে Net ও Gross enrollment rate, ঝরে পড়ার হার, শিক্ষা সর্ম্পকিত অন্যান্য তথ্য-উপাত্ত পাওয়া যায়। বিদ্যালয়ের উপযোগী বয়সে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সংঘটিত পরিবর্তনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জানা যায় যা সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার পরিকল্পনা প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

বিদ্যালয়ের শিক্ষার মানের উপর জনমিতিক বৈশিষ্ট্যের প্রভাব

জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন জনমিতিক বৈশিষ্ট্য ছাড়াও একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব কিছু জনমিতিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা ঐ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার মানের উপর প্রভাব ফেলে। James Berry সহকারী অধ্যাপক State University of West Georgia পরিচালিত একটি গবেষণায় (The Impact of Demographic Factors on School Culture and Climate) দেখা যায় যে মহিলা শিক্ষক, অভিজ্ঞ শিক্ষক এবং অধিক বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন শিক্ষকের উপস্থিতি বিদ্যালয়ে শিক্ষার সংস্কৃতি ও পরিবেশের উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। আরও অন্যান্য গবেষণায় দেখা গিয়েছে লিঙ্গ (Gender), বিদ্যালয়ের অবস্থান, শিক্ষার্থীদের পরিবারের আকার, অর্থনৈতিক অবস্থা ইত্যাদির সাথে শিক্ষার্থীদের কৃতিত্বের (Achievement) উল্লেখযোগ্য সম্পর্ক আছে। আবার

যেসব দেশে অন্য দেশ থেকে স্থানান্তরিত হয়ে আসা লোকজনের সংখ্যা অনেক বেশি সে সব দেশ/অঞ্চলের স্কুলের জনমিতিক বৈশিষ্ট্যের বিভিন্নতা (Race, ভাষা, জাতীয়তা ইত্যাদি) বেশি থাকে। ফলে ঐ সব স্কুলের নীতি নির্ধারণ, শিক্ষার চাহিদা ও পরিকল্পনা প্রণয়ন, শিক্ষামূলক কাজ পরিচালনা- এসব দিক গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করার প্রয়োজন হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাজ্য ইত্যাদি উচ্চ অভিবাসনের দেশগুলোয় এ সমস্যা দেখা যায়।

সর্বশেষে বলা যায় কোন সমাজের জনমিতিক বৈশিষ্ট্য শিক্ষার গতিধারা নিয়ন্ত্রণের অন্যতম নির্ধারক। আবার জনমিতিক বৈশিষ্ট্য কোন স্থিতিশীল বিষয় নয়। বরং উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় তা ক্রমাগত পরিবর্তিত হচ্ছে। সেই সাথে পরিবর্তিত হচ্ছে স্কুল জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য। এ পরিবর্তনের সাথে সামাঞ্জস্য রেখে দেশের জন্য কার্যকরী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার ক্ষেত্রে জনমিতির উপাদানসমূহের গুরুত্ব সাথে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৪

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. কোন জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্যের কোন ধরনের উপস্থাপনাকে জনমিতি বলে?
ক. গুণগত বর্ণনা
খ. বিবরণী
গ. পরিসংখ্যানিক উপস্থাপন

২. কোন জনমিতিক বৈশিষ্ট্যটি শিক্ষাকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করে?
ক. নগরায়ন
খ. স্থানান্তর
গ. মৃত্যুহার
ঘ. জন্মহার

উত্তরমালা: ১. গ, ২. ঘ

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. জনমিতি কী?
২. শিক্ষার জনমিতিক উপাদানের নাম লিখুন।
৩. সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে জনমিতির ভূমিকা কী?
৪. জনমিতি বিদ্যালয় শিক্ষার মানকে কীভাবে প্রভাবিত করে।

খ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. শিক্ষা ও জনমিতির পারস্পারিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করুন।
২. শিক্ষায় জনিমতির উপাদানের প্রভাব আলোচনা করুন।
৩. শিক্ষা কীভাবে জনমিতিক বৈশিষ্ট্যকে প্রভাবিত করে?
৪. বিদ্যালয় শিক্ষার মানের উপর জনমিতিক বৈশিষ্ট্যের প্রভাব বিশ্লেষণ করুন।

পাঠ ৬.৫: সামাজিক স্তরবিন্যাস ও শিক্ষা
Social Stratification and Education

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- সামাজিক স্তরবিন্যাস বলতে কী বুঝায় তা বলতে পারবেন।
- সামাজিক স্তরবিন্যাসের ধরন চিহ্নিত করতে পারবেন।
- শিক্ষা ও সামাজিক স্তরবিন্যাসের আন্তঃসম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

ভূমিকা

মানুষের মধ্যে পার্থক্য বা ভেদাভেদ সমাজের শাশ্বত বিষয়। বয়স, সেক্স ইত্যাদি যেমন মানুষের মধ্যে অসমতা তৈরি করে, তেমনি বংশমর্যাদা, অর্থবিত্ত, ভূমি, শিক্ষা, ক্ষমতা ইত্যাদি সামাজিক স্তরবিন্যাস তৈরি করে। সমাজের গোড়াপত্তনের সময় থেকেই মানুষে মানুষে বৈষম্য, অসমতা এবং ভেদাভেদ পরিলক্ষিত হয়। সমাজের বিবর্তনে বিভিন্ন ধরনের স্তরবিন্যাস সৃষ্টি হয়েছে। আধুনিক সমাজেও নানা সূচকের ভিত্তিতে স্তরবিন্যাস দেখা যায়। স্তরবিন্যাসের ফলে মানুষের মধ্যে যে পার্থক্য সূচিত হয় তা তাদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রেও বৈষম্য সৃষ্টি করে। ফলে শিক্ষার সুযোগও সবাই সমানভাবে পায় না। সমাজের উঁচু স্তরের মানুষের জন্য শিক্ষা যতটা সহজলভ্য, নিচুস্তরের মানুষের জন্য ততটাই কঠিন। শিক্ষা অর্জন এবং এর সুফল প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অর্থ বিনিয়োগ এখন অনিবার্য বাস্তবতা। ফলে ক্ষমতাহীন দরিদ্র মানুষের জন্য শিক্ষা এখনো কষ্টসাধ্য বিষয়।

সামাজিক স্তরবিন্যাস কী (What is Social Stratification)

স্তরবিন্যাসের ইংরেজি প্রতিশব্দ Stratification। শাব্দিক অর্থে সামাজিক স্তরবিন্যাস হলো সমাজের মানুষকে উঁচু-নিচু পর্যায়ে বিভক্ত করা। অর্থাৎ সামাজিক স্তরবিন্যাস হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার দ্বারা সমাজের ব্যক্তি বা গোষ্ঠী ক্ষমতা, মর্যাদা, অর্থবিত্ত কিংবা আভিজাত্যের দিক থেকে স্থায়িভাবে উঁচু-নিচু স্তরে বিভক্ত হয়। সামাজিক স্তরবিন্যাস মূলত সমাজে বিদ্যমান বৈষম্য এবং অসম সুযোগ-সুবিধার ফল। সমাজ কাঠামোর অভ্যন্তরে বিভিন্ন ব্যক্তি, গোষ্ঠী এবং সামাজিক শ্রেণির ক্রমোচ্চ অবস্থানকে সামাজিক স্তরবিন্যাস বলে আখ্যা দেয়া হয়। বস্তুত সামাজিক স্তরবিন্যাস ঘনিষ্ঠভাবে সমাজ কাঠামোর সাথে সম্পৃক্ত। সামাজিক গতিশীলতা ও সামাজিক পরিবর্তনের সাথেও সামাজিক স্তরবিন্যাসের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে।

বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী বিভিন্নভাবে সামাজিক স্তরবিন্যাসকে সংজ্ঞায়িত করেছেন। যেমন– P. Sorokin বলেছেন, “Social stratification means the differentiation of a given population into a hierarchically superposed classes. It is manifested in the existence of upper and lower social layers”. অর্থাৎ নির্দিষ্ট একটি জনগোষ্ঠীর উঁচু-নিচু অবস্থানের ভিত্তিতে শ্রেণিসমূহের মধ্যে যে পার্থক্য বিদ্যমান তাকে সামাজিক স্তরবিন্যাস বলে। H. R. Kerbo Zuvi *Social Stratification and Inequality* (1983:11) গ্রন্থে সামাজিক স্তরবিন্যাসের সংজ্ঞায় বলেছেন, “Social stratification means that inequality has been hardened or institutionalized and there is a system of social relationship that determines who gets what and why”. অর্থাৎ সামাজিক স্তরবিন্যাস বলতে ঐ অসমতাকে বোঝায়, যা সুদৃঢ় কিংবা প্রাতিষ্ঠানিকীকৃত এবং সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে কে কী পাবে, কেন পাবে সে

ব্যবস্থাকে নির্দেশ করে। সামাজিক স্তরবিন্যাসের মূলে রয়েছে সামাজিক অসমতা; সমাজে সম্পদ, ক্ষমতা ও মর্যাদার অসমতা থেকেই সামাজিক স্তরবিন্যাস তৈরি হয়।

কার্ল মার্ক্স (Karl Marx) মনে করেন, সামাজিক স্তরবিন্যাস হচ্ছে সামাজিক মানুষের বিভাজন। এ বিভাজনের ভিত্তি হচ্ছে সমাজে বিদ্যমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। অর্থাৎ উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগের উপর ব্যক্তির অধিকার, মালিকানা এবং উৎপাদন সম্পর্কের আলোকে সমাজে যে শ্রেণি বিভাজন তৈরি হয় তা-ই সামাজিক স্তরবিন্যাস। ম্যাক্স ওয়েবার (Max Weber)-এর মতে, সামাজিক স্তরবিন্যাস হচ্ছে সামাজিক মানুষের বিভাজন। এর ভিত্তি হচ্ছে সম্পত্তি, ক্ষমতা ও মর্যাদা।

পরিশেষে বলা যায়, বিভিন্ন উপাদান এবং সামাজিক রীতিনীতি ও প্রথার ভিত্তিতে সমাজের সদস্যদের মধ্যে যে পার্থক্য এবং ভেদাভেদ পরিলক্ষিত হয় তাই সামাজিক স্তরবিন্যাস। এখানে সামাজিক ভিন্নতা, অসমতা এবং পার্থক্য স্থায়ী, প্রতিষ্ঠিত এবং কাঠামোবদ্ধরূপ পরিগ্রহ করে।

সামাজিক স্তরবিন্যাসের ধরণ (Types of Social Stratification)

অধিকাংশ সমাজবিজ্ঞানী সামাজিক স্তরবিন্যাসের চারটি ধরনের উল্লেখ করেছেন। এগুলো হচ্ছে–

১. দাস ব্যবস্থা (Slavery);
২. সামন্তপ্রথা বা এস্টেট ব্যবস্থা (Estate System)
৩. বর্ণপ্রথা (Caste System) এবং
৪. শ্রেণি ব্যবস্থা (Class System)।

দাস ব্যবস্থা: দাস ব্যবস্থা হচ্ছে প্রথম শ্রেণিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা। আদিম কৃষি সমাজ ব্যবস্থার মধ্য থেকেই দাস ব্যবস্থার উৎপত্তি হয়েছে। দাসের সংজ্ঞায় L. T. Hobhouse বলেছেন, দাস হচ্ছে এমন একজন মানুষ, আইন এবং প্রথা যাকে কারো সম্পত্তিরূপে পরিগণিত করে। চূড়ান্ত বিচারে সে যাবতীয় অধিকার থেকে মুক্ত, বিশুদ্ধ অস্থাবর সম্পত্তি। তার কিছু অধিকার ছিল, কিন্তু তা কোনো গৃহপালিত ষাঁড় বা গাধার চেয়ে বেশি নয়। রোমান আইনে দাসকে বস্তু হিসেবে গণ্য করা হয়েছে, যা প্রভুর উদ্দেশ্য সাধনের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। দাস তার প্রভুর অধিকারভুক্ত সম্পত্তি। এখানে দাস ও দাস-মালিকের মধ্যে চরম পার্থক্যের ভিত্তিতে সামাজিক স্তরবিন্যাস প্রচলিত ছিল।

সামন্ত প্রথা বা এস্টেট ব্যবস্থা: সামাজিক স্তরবিন্যাসের দ্বিতীয় ধরন হল এস্টেট, যা মধ্যযুগে একটি বিশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ইউরোপে বিকশিত হয়েছিল। 'Estate' শব্দের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে জমিদারের মালিকানাধীন জমি। অষ্টাদশ শতকে এস্টেট দ্বারা বিশেষ বিশেষ শ্রেণিকে বুঝানো হত। বস্তুত সামন্ত ব্যবস্থার মাধ্যমে ভূমি ও আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক অবস্থার উপর ভিত্তি করে যে তিনটি ক্রমোচ্চ শ্রেণি সমাজে অবস্থান করত তাকে এস্টেট বলে। এস্টেট ব্যবস্থার তিনটি শ্রেণি হচ্ছে–

১. যাজক শ্রেণি (The clergy— First estate);
২. অভিজাত শ্রেণি (The nobility— Second estate) এবং
৩. সাধারণ শ্রেণি (The commons— Third estate)।

সামন্ত প্রথায় অভিজাত শ্রেণি সবার ভাগ্য নির্ধারণ ও নিরাপত্তা বিধান করত। যাজক শ্রেণি সবার জন্য প্রার্থনা করত এবং সাধারণ শ্রেণি সবার জন্য খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করত। প্রতিটি এস্টেটের মর্যাদা, সুযোগ-সুবিধা, অধিকার ও দায়িত্ব অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে আইন দ্বারা সুনির্দিষ্ট ছিল।

জাতি-বর্ণ-প্রথা: সামাজিক স্তরবিন্যাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধরন হচ্ছে জাতি-বর্ণ-প্রথা। ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় বিশেষ করে হিন্দু সমাজের মধ্যে এ প্রথার প্রচলন রয়েছে। ভারতীয় হিন্দু সমাজে পেশা, রীতিনীতি, সুযোগ-সুবিধা, কর্তব্য ও মূল্যবোধ তাদের ধর্মীয় নীতিমালা এবং বংশধারার সাথে সম্পৃক্ত। বংশগতভাবে নির্ধারিত পেশা, সামাজিক মর্যাদা, অবস্থান, রীতিনীতি এবং আচার-প্রথার অনুসারী ব্যক্তিবর্গ বা জনগোষ্ঠী নির্দিষ্ট বর্ণ হিসেবে পরিচিত। বর্ণপ্রথা প্রসঙ্গে জরংষবু বলেছেন, বর্ণব্যবস্থা হচ্ছে কতগুলো পরিবারের সমষ্টি, যাদের একটা অভিন্ন পদবী আছে এবং যারা একটা অভিন্ন বংশধারার সাথে পরিচিত। তিনি বর্ণপ্রথার তিনটি পূর্বশর্তের উল্লেখ করেছেন। যেমন-

১. একই পূর্বপুরুষের পেশা থেকে আগত;
২. বাইরের সম্প্রদায়ের সাথে কোনো সখ্যতা গড়ে তোলে না;
৩. পূর্বপুরুষের পেশায় নিয়োজিত থাকে।

হিন্দুদের শাস্ত্রীয় বিধানে চারটি বর্ণের উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে:

১. ব্রাহ্মণ: এ বর্ণের সদস্যরা প্রধানত ধর্ম ও বিদ্যাচর্চা করে থাকেন;
২. ক্ষত্রীয়: এ বর্ণ যোদ্ধা শ্রেণি হিসেবে পরিচিত;
৩. বৈশ্য: এরা ব্যবসায়ী শ্রেণি;
৪. শূদ্র: উল্লিখিত তিনটি শ্রেণির বাইরে অন্যান্য পেশাজীবী নিম্ন শ্রেণির মানুষ।

শ্রেণি ব্যবস্থা: সামাজিক স্তরবিন্যাসের এক চিরন্তন রূপ হচ্ছে শ্রেণি ব্যবস্থা। সমাজ ব্যবস্থায় বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে উলম্ব (Vertical) সম্পর্ক থেকেই সামাজিক স্তরবিন্যাস সৃষ্টি হয়। শ্রেণি হচ্ছে কিছু মানুষের সমষ্টি, যারা উৎপাদন ব্যবস্থায় অভিন্ন কার্য সম্পাদন এবং আর্থ-সামাজিক ও মর্যাদার ক্ষেত্রে সম-স্তরে অবস্থান করে। মুক্ত মানুষ ও দাস, সম্ভ্রান্ত ও নিম্ন শ্রেণির মানুষ, ভূস্বামী ও ভূমিদাস, বড় খামার মালিক, দিনমজুর, শাসক এবং শাসিত ইত্যাদি শ্রেণির উদাহরণ। বিভিন্ন উপাদানের ভিত্তিতে সমাজবিজ্ঞানীরা শ্রেণিকে তিনভাগে বিভক্ত করেছেন, যা মূলত শ্রেণিভিত্তিক সামাজিক স্তরবিন্যাসকেও নির্দেশ করে। তিনটি শ্রেণি হচ্ছে–

১. উচ্চবিত্ত শ্রেণি (Upper class);
২. মধ্যবিত্ত শ্রেণি (Middle class) এবং
৩. নিম্নবিত্ত শ্রেণি (Lower class)।

অর্থনৈতিক দিক থেকে উচ্চ শ্রেণি হচ্ছে যাঁরা অধিক সম্পদের মালিক। উৎপাদন ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণও এঁদের হাতে। মধ্যবিত্ত হচ্ছে যাদের খুব বেশি সম্পত্তি নেই, কিন্তু অন্যের সাহায্য গ্রহণেরও প্রয়োজন হয় না। নিম্ন শ্রেণি হচ্ছে শ্রমজীবী মানুষ, যাদের তেমন কোনো অর্থ-সম্পত্তি নেই। পেশা, ক্ষমতা, শিক্ষা ইত্যাদি উপাদানের ভিত্তিতেও শ্রেণিকে উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত এই তিনভাগে বিভক্ত করা যায়।

সামাজিক স্তরবিন্যাস ও শিক্ষা (Social Stratification and Education)

সামাজিক স্তরবিন্যাসের সাথে শিক্ষার সম্পর্ক চিরন্তন। সব সময় সব সমাজে শিক্ষার সুযোগ উচ্চ শ্রেণির জন্য অনেক বেশি অবারিত এবং সহজলব্ধ। পক্ষান্তরে নিম্ন শ্রেণির মানুষ প্রায়শ শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয় কিংবা তাদেরকে শিক্ষার জন্য সংগ্রাম করতে হয়। প্লেটো তার 'দি রিপাবলিক' গ্রন্থে যে শিক্ষা ব্যবস্থার কথা বলেছেন তাও সর্বজনীন ছিল না। তিনি রাষ্ট্রের অভিভাবক, শাসক বা সম্ভ্রান্ত শ্রেণির চরিত্র গঠনে শিক্ষা গ্রহণের উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। কৃষক, মজুর, সাধারণ মানুষের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি স্বীকার করেননি।

দাস ব্যবস্থায় দাসদের জন্য, সামন্ত প্রথায় ভূমিদাসদের জন্য শিক্ষার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। জাতিবর্ণ প্রথায় শূদ্র

জনগোষ্ঠীর ছেলেমেয়েরাও শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শূদ্র, হরিজন বা অস্পৃশ্য জাতের ছেলেমেয়েদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা প্রচলিত ছিল। শ্রেণি ব্যবস্থায়ও শ্রমজীবী ও নিম্নবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েরা প্রায়ই শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে না। দারিদ্র্য, শোষণ, সামাজিক বৈষম্য, সুযোগ ও সচেতনতার অভাব ইত্যাদি কারণে নিম্নবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েরা শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। সুতরাং, সামগ্রিকভাবে সামাজিক স্তরবিন্যাসের সাথে শিক্ষার সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। সমাজের যারা উঁচু স্তরে তাদের জন্য শিক্ষা লাভ করা যত সহজ, নিচু স্তরের মানুষের জন্য ততটাই কঠিন।

তবে একবিংশ শতকের আধুনিক ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় শিক্ষাকে সর্বজনীন বলে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। শিক্ষা মানুষের সুযোগ নয়, মৌলিক অধিকার। শিক্ষা এখন প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছে। প্রাথমিক শিক্ষাকে জাতি-ধর্ম, বর্ণ, ছেলে-মেয়ে নির্বিশেষে সবার জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। সমাজের যে যে স্তরে অবস্থান করুক, শিক্ষা সবার জন্য বাধ্যতামূলক। উচ্চবিত্ত, ধনী কিংবা প্রভাবশালী কোনো আমলা বা মন্ত্রীর সন্তানকে যেমন শিক্ষা লাভ করতে হবে, তেমনি বর্ণপ্রথার শূদ্র-সন্তান, ন্যূনতম মুজরির একজন পোশাক শ্রমিকের সন্তানও তেমনি শিক্ষা লাভ করবে।

শিক্ষার জন্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি অনেক বেসরকারি প্রতিষ্ঠানও এখন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। একইসাথে শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণও ক্রমশ বিস্তার লাভ করছে। শিক্ষায় বিনিয়োগ এখন এক অনিবার্য বাস্তবতা। এটি রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে যেমন সত্য, তেমনি ব্যক্তি পর্যায়েও। যে পরিবার তার সন্তানের শিক্ষার জন্য অধিক বিনিয়োগ করবে সে পরিবার তত বেশি সুফল পাবে। বিনা বেতন, বিনামূল্যের বই সরবরাহসহ শিক্ষা ক্ষেত্রে নানা রাষ্ট্রীয় সহায়তা সত্ত্বেও নিম্নবিত্ত, শ্রমজীবী ও দরিদ্র কৃষক পরিবারের ছেলেমেয়েরা উচ্চশিক্ষার সুযোগ খুব বেশি পাচ্ছে না। ভালো ফলাফলের জন্য প্রায়ই ব্যয়বহুল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন করতে হয়। কোচিং, প্রাইভেট টিউশনি, রকমারি গাইড বই ইত্যাদি ভালো ফলাফলের পূর্বশর্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। মেডিক্যাল কিংবা ইঞ্জিনিয়ারিং-এ অধ্যয়নও অনেক ব্যয়বহুল। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে (প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা বিদেশে) উচ্চশিক্ষা গ্রহণ সামাজিক স্তরবিন্যাসের নিম্নবর্গের মানুষের পক্ষে দুঃস্বপ্ন ছাড়া কিছু নয়। ফলে উচ্চশিক্ষা মূলত বিত্তশালীদের হাতের নাগালে। দরিদ্র মানুষ এতবেশি বিনিয়োগ করতে পারছে না। ফলে শিক্ষার পরিপূর্ণ সুফল দরিদ্র মানুষের ঘরে কখনো পৌঁছে না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৫

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. Stratification শব্দের অর্থ কী?
ক. ধনী-গরিব
খ. সমাজের মানুষের উঁচু-নিচু ভেদাভেদ
গ. দাস-প্রভু সম্পর্ক
ঘ. বৈষম্য

২. সামাজিক স্তরবিন্যাসের প্রধান ধরন কয়টি?
ক. দু'টি
খ. তিনটি
গ. চারটি
ঘ. পাঁচটি

৩. সামন্তপ্রথা কখন কোথায় বিকশিত হয়েছিল?
ক. মধ্যযুগে, ইউরোপে
খ. আদিম যুগে, আফ্রিকায়
গ. আধুনিক যুগে, এশিয়ায়
ঘ. কোনোটি নয়

উত্তরমালা: ১. খ, ২. গ, ৩. ক

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. সামাজিক স্তরবিন্যাস কী?
২. সামাজিক স্তরবিন্যাসের ধরনগুলো কী কী?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. সামাজিক স্তরবিন্যাসের ধরনগুলো আলোচনা করুন।
২. সামাজিক স্তরবিন্যাসের সাথে শিক্ষার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ ৬.৬: শিক্ষার গ্রামীণ ও নগর প্রেক্ষিত
Rural and Urban Context of Education

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- গ্রামীণ ও নগর সমাজের ধারণা ব্যক্ত করতে পারবেন।
- গ্রামীণ ও নগর সমাজের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- শিক্ষার গ্রামীণ ও নগর সমাজের প্রেক্ষিত ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

ভূমিকা

সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষা হচ্ছে আনুষ্ঠানিক বা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, মাদ্রাসা ও অন্যান্য বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। ব্যাপক অর্থে শিক্ষা বলতে বিদ্যায়তনের আনুষ্ঠানিক শিক্ষাকে বোঝায় না। শিক্ষা হল বিশেষ সংস্কার সাধন। আনুষ্ঠানিকভাবে শিক্ষক ছাড়াও শিখন বা 'শিক্ষা' সম্ভব। শিক্ষা সমাজের জীবনধারার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। শিক্ষার উপর পরিবেশের সামগ্রিক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। সেদিক থেকে গ্রামীণ ও নগর জীবন শিক্ষাকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করে। গ্রামীণ সমাজে প্রাতিষ্ঠানিক বিশেষ করে উচ্চশিক্ষার সুযোগ খুবই সীমিত। সনাতন কৃষি পেশার মানুষের কাছে শিক্ষার গুরুত্বও কম। কিন্তু নগর সমাজে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ অনেক অবারিত। নাগরিক জীবনে শিক্ষার গুরুত্ব এবং এ সম্পর্কে সচেতনতাও অনেক বেশি। ফলে গ্রামীণ ও নগর জীবনে শিক্ষার প্রেক্ষিত আলাদা।

গ্রামীণ সমাজ (Rural Society)

বিশ্বসভ্যতার উৎসমূল হচ্ছে গ্রামীণ সমাজ। কৃষি কাজ এবং কৃষক সমাজ নিয়েই গ্রামীণ জনপদ গড়ে ওঠে। গুচ্ছ গুচ্ছ বাড়ি-ঘর, চাষযোগ্য জমি, কৃষকের উঠান, গরু-লাঙ্গল-জোয়ালসহ কৃষকের জমিকর্ষণ, রাখালের গরু চরানো, আঁকা-বাঁকা কাঁচা সড়ক, নদী, পালতোলা নৌকা, বৃক্ষরাজি, পাখির গান সবকিছু নিয়েই গঠিত হয় গ্রাম। গ্রামের অধিবাসীরা যে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে তোলে তাই গ্রামীণ সমাজ। গ্রামে জনবসতির ঘনত্ব কম। যান্ত্রিক সভ্যতা থেকে বিচ্ছিন্ন এক জনপদ হচ্ছে গ্রাম। চারদিকে বিস্তৃর্ণ ফসলের মাঠ, সবুজ বৃক্ষ, পরিমিত দূরত্বে একটির পর একটি বাড়ি, কয়েকটি বাড়ির সমন্বয়ে গঠিত পাড়া এবং কয়েকটি পাড়া নিয়ে গড়ে ওঠে গ্রাম। প্রতিটি গ্রামের নিজস্ব নাম ও স্বকীয় পরিচয় রয়েছে। পাড়ার লোকেরা প্রায়শ জ্ঞাতিগোষ্ঠীর সম্পর্কে আবদ্ধ। গ্রামীণ সমাজের সবাই একে অপরের সাথে পরিচিত এবং কোনো না কোনো সম্পর্কে আবদ্ধ। তারা অনেক সময় একে অপরের সাথে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হয়; কিন্তু বিপদ-আপদে আবার পাড়া-প্রতিবেশী এবং জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর লোকেরাই সবার আগে ছুটে আসে।

গ্রামীণ অর্থনীতি, জীবন-জীবিকা, পেশা, সংস্কৃতি ইত্যাদি অনেকটাই কৃষিকেন্দ্রিক। কৃষকরাই গ্রামের প্রাণ। তবে সাম্প্রতিককালে গ্রামীণ সমাজেও ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। বিদ্যুতায়ন, সড়ক যোগাযোগ, মোবাইল টেলিফোন ইত্যাদি গ্রামীণ সমাজকে আধুনিকায়িত করছে। যৌথ পরিবার ভেঙ্গে তৈরি হয়েছে একক পরিবার। কৃষি বহির্ভুত পেশাও ক্রমশ বিকশিত হচ্ছে। কৃষিতে আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। অবকাঠামো, বিদ্যুৎ, ভবন, রাস্তাঘাট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারি বিভিন্ন দপ্তর, মানুষের ভাষা, রুচি, আচরণ ইত্যাদি গ্রামীণ

সমাজে নগরের সুবিধা দান করছে। ফলে গ্রামের সাথে শহরের বিশাল পার্থক্য দিনদিন একটু একটু করে হলেও হ্রাস পাচ্ছে। তবে ভূমি ব্যবস্থা, কৃষি, স্বল্পমাত্রার প্রযুক্তি ব্যবহার, নিরক্ষর বা স্বল্পশিক্ষিত মানুষ, জ্ঞাতিসম্পর্ক, সীমিত শ্রমবিভাজন, সরল সামাজিক স্তরবিন্যাস ইত্যাদি গ্রামীণ সমাজের শাশ্বত বৈশিষ্ট্য।

নগর সমাজ (Urban Society)

আধুনিক সভ্যতার গৌরবোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হচ্ছে নগর সমাজ। সাধারণত শিল্পভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা, পাকাসড়ক, আলো ঝলমলে মার্কেট, সুউচ্চ ভবন ইত্যাদি নিয়েই সগর সমাজ গড়ে ওঠে। নগর সমাজে জনসংখ্যার ঘনত্ব অনেক বেশি এবং তাদের মধ্যে সাধারণত কোনো জ্ঞাতিসম্পর্ক থাকে না। নগরে বসবাসরত মানুষের মধ্যে নানা ধরনের বৈসাদৃশ্য, পার্থক্য, অসমতা বা বিভাজন পরিলক্ষিত হয়। নগর সমাজ পরিচালনার জন্য নির্দিষ্ট সরকার ব্যবস্থা বা প্রশাসনিক কাঠামো পরিলক্ষিত হয়। প্রাচীন গ্রিসে নগরকেন্দ্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। এখন প্রতিটি রাষ্ট্রেই প্রশাসনিক কার্যক্রম, শিল্প-কারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা, চিকিৎসা, তীর্থভূমি ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে নগর গড়ে ওঠে। উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, কর্মব্যস্ততা, শিক্ষা, সচেতনতা, প্রযুক্তি প্রভৃতি নগর জীবনকে অনেক বেশি গতিশীল করে তোলে। কর্মসংস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসাসহ দৈনন্দিন জীবনের নানা সুযোগ-সুবিধার পাশাপাশি নগর জীবনে অনেক আরাম-আয়েশ, ভোগ-বিলাসি, আনন্দ-বিনোদনের হাতছানি রয়েছে। উচ্চবিত্তের সুরম্য অট্টালিকার পাশাপাশি নগর সমাজের অনিবার্য বাস্তবতা হচ্ছে বস্তি সমস্যা। নিম্নআয়ের শ্রমজীবী মানুষের নগর জীবনের ঠিকানা হচ্ছে বস্তি। নাগরিক সুবিধা নিশ্চিত করতে নগর জীবনে এদেরকেও ঠাঁই দিতে হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনার ভিত্তিতে সংক্ষেপে বলা যায়, নগর সমাজ হচ্ছে সীমাবদ্ধ আয়তনে বিপুলসংখ্যক মানুষের বসতি যাদের অধিকাংশ শিল্প এবং সেবাভিত্তিক উৎপাদন বা উপার্জনমূলক কাজে নিয়োজিত থাকে। অবকাঠামো, বাহ্যিক চাকচিক্য, ব্যস্ত জীবন প্রভৃতি নগর সমাজের স্বাতন্ত্র্য তৈরি করে।

গ্রামীণ ও নগর সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা (Rural and Urban Context of Education)

আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা মূলত প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক। নারী-পুরুষক, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করতে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি অনেক ব্যাক্তিগত বা বেসরকারি উদ্যোগও পরিলক্ষিত হয়। তবে এসব উদ্যোগে গ্রামীণ ও নগর সমাজের মধ্যে পার্থক্য বা বৈষম্য দেখা যায়। দেশের প্রত্যন্ত অনেক গ্রাম, বিচ্ছিন্ন চরাঞ্চল, কিংবা পাহাড়ী অঞ্চলে প্রয়োজনানুযায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এখনো গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। প্রাথমিক এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার জন্য স্কুল-মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা হলেও গ্রামীণ সমাজে উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান দুর্লভ। দেশের সব পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলো শহরেই গড়ে উঠেছে। উচ্চশিক্ষার ঐতিহ্যবাহী কলেজগুলোও শহরকেন্দ্রিক। যোগাযোগ ব্যবস্থা, অভিভাবকদের সচেতনতা, নগদ অর্থ উপার্জন, সন্তানদের শিক্ষার জন্য খরচ করার মানসিকতা নগর সমাজে শিক্ষার সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নগর সমাজে শিক্ষার বাণিজ্যিকরণও চোখে পড়ার মত। ব্যক্তিগত উদ্যোগে কিন্ডারগার্টেন স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মূলে রয়েছে বাণিজ্যিক মনোভাব। গ্রামীণ জনপদে বাণিজ্যের সুযোগ কম। তাই বেসরকারী উদ্যোগে সেখানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার উদ্যোগও সীমিত।

গ্রামীণ ও নগর সমাজের শিক্ষার মধ্যে বহুমুখী পার্থক্য রয়েছে। গ্রামে প্রাথমিক স্তরে সরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষাই মৌলিক শিক্ষা। এছাড়া মাদ্রাসা বা মক্তবকেন্দ্রিক শিক্ষাও সেখানে অনেক জনপ্রিয়। কিন্তু শহরে প্রচলিত বাংলা মাধ্যমের শিক্ষা ছাড়াও কিন্ডারগার্টেন, ইংলিশ মিডিয়াম, ইংলিশ ভার্সন, ক্যাডেট ইত্যাদি শিক্ষার বিশেষ চাহিদা পরিলক্ষিত হয়। মোড়ে মোড়ে কোচিং সেন্টার এখন নগর শিক্ষার এক অপ্রিয় বাস্তবতা। গ্রামে সচরাচর কোচিং সেন্টার দেখা যায় না। তবে স্কুলের শিক্ষকের কাছে ‘ব্যাচে’ বা ‘প্রাইভেট’ পড়ার প্রচলন রয়েছে। গ্রামের ছেলেমেয়েরা পরিবার, সমাজ, প্রকৃতি এবং জীবন থেকে অনেক বেশি শিক্ষা লাভের সুযোগ পায়। কিন্তু নগর

সমাজের ছেলেমেয়েরা সমাজ, জীবন ও প্রকৃতির বাস্তব জ্ঞান লাভ করে খুব কম। তবে তারা প্রযুক্তি ব্যবহারে বেশি পারদর্শী।

গ্রামে মানসম্মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব রয়েছে। তাই সচেতন ও সামর্থ্যবান অভিভাবকগণ তাদের ছেলেমেয়েদের শহরে রেখে লেখাপড়া করাতে সচেষ্ট হন। গ্রাম থেকে শহরে স্থানান্তর গমনের (Migration) অন্যতম কারণ হচ্ছে ছেলেমেয়েদের মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা। অনেকে পেশাগত প্রয়োজনেও মফস্বল শহর কিংবা গ্রামে যেতে চান না কেবল ছেলেমেয়েদের শিক্ষার কথা চিন্তা করে। উচ্চশিক্ষিত, দক্ষ এবং অভিজ্ঞ কোনো ব্যক্তি সচরাচর গ্রামে থাকেন না কিংবা গ্রামে যেতে চান না। শিক্ষাসহ নানা সুযোগ-সুবিধা মানুষকে নগর জীবনের প্রতি আকৃষ্ট করে তোলে। গ্রামে কোনো শিক্ষা গড়ে তুললেও সেখানে ভালো শিক্ষকরে অভাব পরিলক্ষিত হয়। ফলে মানসম্মত এবং প্রতিযোগিতামূলক শিক্ষায় গ্রামীণ সমাজ কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি লাভে ব্যর্থ হয়।

বাংলাদেশের সংবিধান গ্রাম ও শহরের সর্বত্র শিক্ষার সমান সুযোগ সৃষ্টি উপর গুরুত্বারোপ করেছে। সংবিধানের ১৬ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "নগর ও গ্রামাঞ্চলে জীবনযাত্রার মানের বৈষম্য ক্রমাগতভাবে দূর করিবার উদ্দেশ্যে কৃষি বিপ্লবের বিকাশ, কুটির শিল্প ও অন্যান্য শিল্পের বিকাশ এবং শিক্ষা, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের আমূল রূপান্তর সাধনের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে" (১৯৮৫:৫)। ১৯ (১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করিতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হইবেন"। অনুচ্ছেদ ২৮ (৩) এ বলা হয়েছে, "কেবল ধর্ম, বর্ণ, নারী-পুরুষ ভেদে বা জন্মস্থানের কারণে জনসাধারণের কোনো বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের বা কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোনো নাগরিককে কোনোরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাইবে না" (১৯৯৮:৫-৬)।

বস্তুত রাষ্ট্র কখনো তার নাগরিকদের মধ্যে বৈষম্য তৈরি করতে পারে না। গ্রামে গ্রামে স্কুল প্রতিষ্ঠা করে সেখানে মানসম্মত শিক্ষক নিয়োগ করা হলে শিক্ষা ক্ষেত্রে গ্রাম ও শহরের বৈষম্য হ্রাস পাবে। শিক্ষা ক্ষেত্রে বরাদ্দ বাড়িয়ে দরিদ্র মানুষের মাধ্যমিক এবং উচ্চশিক্ষার পথ সুগম করা প্রয়োজন। গ্রামের একজন দরিদ্র কৃষকও যেন তার মেধাবী সন্তানটিকে কার্যকর উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে পারে সে পরিবেশ সৃষ্টি করা জরুরি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৬

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. গ্রামীণ সমাজ প্রধানত–
ক. কৃষিভিত্তিক
খ. ব্যবসায়ভিত্তিক
গ. শিল্পোৎপাদন নির্ভর
ঘ. সেবা নির্ভর

২. জীবন-যাপনের আধুনিক সুযোগ-সুবিধা রয়েছে–
ক. গ্রামে
খ. শহরে
গ. উপশহরে
ঘ. সবগুলোই সঠিক

৩. ‘সবার জন্য সুযোগের সমতা বিধানে রাষ্ট্র সচেষ্ট হইবেন’ সংবিধানের কত অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে?
ক. ১৬ অনুচ্ছেদ
খ. ১৮ অনুচ্ছেদ
গ. ১৯(১) অনুচ্ছেদ
ঘ. ২৮(৩) অনুচ্ছেদ

উত্তরমালা: ১. ক, ২. খ, ৩. গ

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. গ্রামীণ সমাজের বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী?
২. গ্রাম ও নগর সমাজের পার্থক্যগুলো কী কী?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. ‘নগর সমাজের তুলনায় গ্রামীণ সমাজে শিক্ষার সুযোগ সীমিত’ কীভাবে? আলোচনা করুন।
২. সংবিধানের আলোকে সবার জন্য শিক্ষার সমান সুযোগ নিশ্চিতকরণে রাষ্ট্রের ভূমিকা ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ ৬.৭: শিল্পায়ন ও শিক্ষা
Industrialization and Education

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- শিল্পায়ন বলতে কী বুঝায় তা বলতে পারবেন।
- শিল্পায়নের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- শিল্পায়ন ও শিক্ষার আন্তঃসম্পর্ক ব্যাখা করতে পারবেন।

ভূমিকা

আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থার মূলে রয়েছে শিল্পায়ন। শিল্পায়ন নগরায়ন, আধুনিকায়ন এবং শিক্ষার সম্প্রসারণের সাথেও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। উন্নত ও প্রযুক্তিনির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থার সম্প্রসারণই শিল্পায়নের মূল ভিত্তি। শিল্পায়নের প্রয়োজনে শিক্ষার বিস্তার ঘটে; আবার শিক্ষিত জনগোষ্ঠী শিল্পায়নে সহায়ক। আধুনিক এবং উন্নত জীবন-যাপনের জন্য শিল্পায়ন ও শিক্ষা দু'টিই অপরিহার্য। শিল্পায়ন কেবল অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পৃষ্ঠপোষক নয়, জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং সচেতনতা সৃষ্টিতেও সহায়ক। শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধির কারণে নগর জীবনের শিল্প-ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ শিক্ষার প্রতি বেশি অনুরাগী। একটি শিক্ষিত জাতি যেমন শিল্পায়নে অগ্রসর, তেমনি শিল্পোন্নত যেকোনো দেশই মানসম্মত শিক্ষায় এগিয়ে থাকে। সুতরাং শিল্পায়ন এবং শিক্ষা পরস্পরের পরিপূরক দু'টি প্রত্যয়।

শিল্পায়ন (Industrialization)

শিল্পের প্রসার হচ্ছে শিল্পায়ন। অর্থাৎ কোনো দেশ যদি সনাতন কৃষি পেশার পরিবর্তে ব্যাপকভাবে শিল্প-কল-কারখানা স্থাপনে উদ্যোগী হয় তখন তাকে শিল্পায়ন বলে। বস্তুত শিল্পায়ন হচ্ছে কল-কারখানা স্থাপন ও সেগুলোর প্রসার। শিল্পায়নের সংজ্ঞায় John Cornwall (1985: 386) বলেছেন- The term industrialization is meant to denote a phase of economic development in which capital and labor resources shift both relatively and absolutely from agricultural activities into industry specially manufacturing.

অর্থাৎ শিল্পায়ন প্রক্রিয়ায় পুঁজি এবং শ্রমশক্তি কৃষিভিত্তিক কার্যক্রম থেকে শিল্পের দিকে স্থানান্তরিত হয়। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে শিল্প-কারখানায় বৃহৎ পরিসরে বাজারজাতকরণের জন্য উৎপাদন করা হয়। শিল্পোৎপাদন প্রক্রিয়ায় প্রাকৃতিক সম্পদে বাড়তি উপযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে অধিকতর ব্যবহারোপযোগী করা হয়। মুনাফা অর্জনকে উৎসাহিত করে বলে শিল্পায়নে ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিস্তৃতি ঘটে।

জাতিসংঘের শিল্পায়ন কমিটির মতে, শিল্পায়ন অর্থনৈতিক উন্নয়নের এমন একটি প্রণালী যাতে জাতীয় সম্পদের একটি ক্রমবর্ধমান অংশ অভ্যন্তরীণ আর্থিক সংগঠনের জন্য নিযুক্ত হয় যা একাধারে প্রযুক্তিবিদ্যাসম্মত, আধুনিক ও বৈচিত্র্যময়। অর্থাৎ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে আশ্রয় করে উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তন প্রক্রিয়া হচ্ছে শিল্পায়ন। এখানে হস্তচালিত যন্ত্রের পরিবর্তে শক্তিচালিত যন্ত্রের প্রয়োগ লক্ষ্যণীয়। শিল্পায়ন একসাথে বিপুল উৎপাদনকে উৎসাহিত করে। যেমন বাংলাদেশে তৈরি পোশাকের শিল্পায়ন। এছাড়া চা, চামড়া, পাটসহ বিভিন্ন শিল্পে ব্যাপকভিত্তিক উৎপাদন শিল্পায়নের পরিচায়ক। ষোল কোটি মানুষের কৃষিনির্ভর এদেশে কৃষি এবং খাদ্যসামগ্রী উৎপাদনের

শিল্পায়নও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শিল্পায়নের মূল লক্ষ্য হচ্ছে মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে বাজারের জন্য উৎপাদন এবং পুঁজির বিকাশ।

শিল্পায়নের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Industrialization)

শিল্পায়নের কতগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে। নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে শিল্পায়িত সমাজকে উপলব্ধি করা যায়।

১. **যন্ত্রশক্তির ব্যবহার ও প্রসার:** শিল্পায়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে যান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা। উৎপাদনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যন্ত্রশক্তির ব্যবহার শিল্পায়নকে ত্বরান্বিত করে। শিল্পায়নের ফলে শিল্প-কল-কারখানা এমনকি কৃষি এবং সেবাখাতেও যন্ত্রের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়।

২. **বৃহদায়তন উৎপাদন:** শিল্পায়নের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বৃহদায়তনের উৎপাদন। মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে বাজারজাতকরণের জন্য বিভিন্ন ভোগ্যপণ্যের ব্যাপকভিত্তিক উৎপাদন পরিলক্ষিত হয়।

৩. **মজুরিভিত্তিক শ্রম:** শিল্পায়িত উৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রমের মূল্য পরিশোধ হয় নির্ধারিত মজুরিতে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে শ্রমিক-স্টাফ সবার মজুরি পরিশোধ হয় মাসিক ভিত্তিতে। তবে ঘন্টা, দৈনিক হাজিরা, সাপ্তাহিক এবং চুক্তিভিত্তিক মজুরি পরিশোধের প্রচলনও পরিলক্ষিত হয়।

৪. **প্রতিযোগিতামূলক বাজার ব্যবস্থা:** শিল্পায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রতিযোগিতামূলক বাজার ব্যবস্থা। এখানে বৃহৎ পরিসরে উৎপাদন হয় মূলত বাজারজাতকরণের জন্য।

৫. **কৃষির পরিবর্তে শিল্পভিত্তিক অর্থনীতি:** শিল্পায়ন কৃষি অর্থনীতির উপর ক্রমশ নির্ভরশীলতা কমিয়ে আনে। অর্থনীতির সর্বত্র শিল্পের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। পেশা, মাথাপিছু আয়, জীবনযাত্রার মান, রাজস্ব, জিডিপি সবকিছু শিল্পোৎপাদন দ্বারা প্রভাবিত, কখনো কখনো নিয়ন্ত্রিত।

৬. **বিশেষায়িত শ্রমবিভাজন:** শিল্পায়নের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বিশেষায়িত শ্রমবিভাজন। মানসম্মত এবং দ্রুতগতির উৎপাদনের জন্য প্রতিটি পর্যায়ে দক্ষ এবং বিশেষজ্ঞ শ্রমিক/কারিগর নিয়োগ করা হয়।

৭. **পুঁজিবাদের পৃষ্ঠপোষক:** শিল্পায়ন পুঁজিবাদের পৃষ্ঠপোষক। ব্যক্তিগত মালিকানা, প্রতিযোগিতামূলক বাজার ব্যবস্থা, মুনাফা, পুঁজি গঠন, বিশেষায়িত শ্রম ইত্যাদি যেমন শিল্পায়নের বৈশিষ্ট্য, তেমনি পুঁজিবাদেরও।

৮. **নগরায়ন বা শহুরে সভ্যতার বিকাশ:** শহুরে সভ্যতা বিকাশে শিল্পায়নের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেবল শিল্প-কল-কারখানাকে কেন্দ্র করে বিশ্বে অসংখ্য নগর গড়ে উঠেছে। শিল্পায়নের ফলে বিদ্যুতায়ন, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, যোগাযোগ ব্যবস্থা, আবাসিক এলাকা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল ইত্যাদি নগরায়নকে ত্বরান্বিত করে।

৯. **সমাজে বৈষয়িক চিন্তার প্রসার ঘটায়:** শিল্পায়ন সমাজে বৈষয়িক চিন্তার প্রসার ঘটায়। মানুষ তার দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় ক্রমশ সৌখিন ও আরামপ্রিয় হয়ে ওঠে। তার চাহিদা দিন দিন বাড়তে থাকে।

১০. **আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার পৃষ্ঠপোষক:** বৈশিষ্ট্যগত দিক দিয়েই শিল্পায়নের সাথে শিক্ষার সম্পর্ক রয়েছে। শিল্পায়ন শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে। শিল্পের প্রয়োজনে নতুন নতুন শাখায় শিক্ষা, উচ্চতর গবেষণা, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি চালু হয়।

১১. **জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যাপক প্রসার:** শিল্পসমাজে শিক্ষাকে গণমানুষের জন্য সহজ এবং উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। প্রশিক্ষণ ও গবেষণা ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করে। প্রতিটি বিষয়ে সুবিন্যস্ত জ্ঞান চর্চার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়।

১২. **দক্ষ মানবসম্পদ:** শিল্পায়নের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দক্ষ মানব সম্পদ তৈরি। শিল্পোৎপাদনসহ প্রতিটি ক্ষেত্রেই দক্ষ-বিশেষজ্ঞ মানব সম্পদ কাজ করে। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি করা হয়।

১৩. **পেশাজীবী শ্রেণির বিকাশ:** শিল্পায়নের ফলে পেশাজীবী শ্রেণির ব্যাপক বিকাশ ঘটে। শিল্প উৎপাদনকে সচল রাখার স্বার্থেই বহুসংখ্যক পেশাজীবীকে সক্রিয় থাকতে হয়। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবহন, প্রতিরক্ষা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিসহ বিভিন্ন সেবামূলক কাজে নিয়োজিত পেশাজীবীর শ্রেণির উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

১৪. **কর্মসংস্থানের সম্প্রসারণ:** শিল্পায়নের ফলে কাজের সুযোগ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। শিল্পায়ন কাজের ক্ষেত্রকে দিগন্ত বিস্তৃত করে তোলে। এখানে দক্ষ মানবসম্পদ বিস্তৃত কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত থাকে।

শিল্পায়ন ও শিক্ষা (Industrialization and Education)

আধুনিক উন্নয়নে শিক্ষার পাশাপাশি শিল্পায়নও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নগরায়ন ও আধুনিকায়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে শিক্ষা ও শিল্পায়ন। শিল্পায়নের মধ্য দিয়েই আধুনিক সমাজ বিকশিত হয়েছে। শিল্পের বিকাশের সাথে সাথে শিক্ষার বিস্তারও অপরিহার্য হয়ে ওঠে। শিল্পোন্নত সমাজ যেমন শিক্ষায় অগ্রসরতা লাভ করে, তেমনি শিক্ষিত জাতি শিল্পায়নের মাধ্যমে সমৃদ্ধি অর্জন করে। শিল্পায়ন ও শিক্ষার আন্তঃসম্পর্ক নিম্নে আলোচনা করা হল–

১. শিক্ষার মাধ্যমে মানব-পুঁজি (Human Capital) গড়ে ওঠে। আধুনিক ও প্রযুক্তিনির্ভর শিল্পোৎপাদনের জন্য দক্ষ মানবসম্পদ অপরিহার্য। শিক্ষার মাধ্যমে গড়ে ওঠা এ মানবসম্পদ শিল্পের বিকাশে মানব-পুঁজি হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

২. শিল্পায়ন মেধার সঞ্চালন (Brain-Drain) ঘটায়। শিল্পায়নের ফলে বিশ্বব্যাপী প্রশিক্ষিত, দক্ষ এবং উচ্চশিক্ষিত মেধাবী জনবলের বিশেষ চাহিদা রয়েছে। চাহিদা মেটাতে মানুষ পেশাগত সম্ভাবনাকে বিবেচনায় নিয়ে শিক্ষা অর্জনে তৎপর হয়।

৩. শিক্ষার সাথে আর্থিক নিরাপত্তার বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। একটি দরিদ্র পরিবারের শিক্ষিত সন্তান যেমন ওই পরিবারের আর্থিক নিরাপত্তা তৈরি করতে পারে, আবার সচ্ছল পরিবারের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা অর্জন সহজতর হয়। তারা শিক্ষার জন্য বিনিয়োগ করতে পারেন। শিল্পায়নের সংস্কৃতি এ ধরনের বিনিয়োগকে উৎসাহিত করে।

৪. আধুনিক শিক্ষা অনেকটাই প্রযুক্তিনির্ভর। প্রযুক্তির সরবরাহ করে শিল্প-কারখানা। আধুনিককালের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি শিক্ষা ক্ষেত্রে বিপ্লব সাধন করেছে। কম্পিউটার, স্মার্ট ফোন, মাল্টিমিডিয়াসহ প্রযুক্তির সব উপকরণ (ডিভাইস) প্রস্তুত হয় শিল্প-কারখানায়। বস্তুত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ উপরণের প্রায় সবকিছু শিল্প-পণ্য। এদিক থেকে শিক্ষার বড় পৃষ্ঠপোষক হচ্ছে শিল্প।

৫. শিল্পায়ন শিক্ষাকে সবার জন্য উন্মুক্ত করেছে। এখন শিক্ষা গ্রহণ কোনো সুযোগ নয়, অধিকার। শিল্পে শিক্ষিত ও দক্ষ জনশক্তির চাহিদা, রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন, মানুষের অধিকার সচেতনতার ফলে এখন ধনী-দরিদ্র, নারী-পুরুষ, গ্রাম-শহর সবাই, সর্বত্র শিক্ষা অর্জনে তৎপর। নতুন নতুন বিষয় ও শাখায় গণশিক্ষার সুযোগ তৈরি হয়েছে।

৬. শিক্ষা শিল্প ও অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করেছে। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের ফলে রাষ্ট্রের পাশা পাশি ব্যক্তিগতভাবে অনেকে শিক্ষা ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করছেন। এ বিনিয়োগ বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে যেমন, তেমনি সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকেও। অনেকে তাদের প্রতিষ্ঠানের সিএসআর (Corporate Social Responsibilities) ফান্ড থেকে সেবাভিত্তিক অলাভজনক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। বেসরকারিভাবে প্রতিষ্ঠিত এসব বাণিজ্যিক বা অলাভজনক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষার বিস্তারে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে।

৭. উন্নয়নীল দেশে শিল্পায়ন অনেক সময় শিক্ষা ক্ষেত্রে অন্তরায়ও সৃষ্টি করে। দারিদ্র্যের কারণে মানুষ কাজের সুযোগ পেলেই সেখানে যুক্ত হতে পারে। শিল্প সহায়ক অনেক প্রতিষ্ঠানে শিশু শ্রমিকদেরকে নিয়োগ করা হয়। অনেকে আবার শিক্ষা সম্পন্ন করার আগেই কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে। নগদ অর্থের হাতছানি শিক্ষা বিস্তারে অন্তরায় সৃষ্টি করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৭

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. শিল্পায়নের সূচনা হয়–
ক. ফরাসী বিপ্লবের মধ্য দিয়ে
খ. শিল্পবিপ্লবের মধ্য দিয়ে
গ. ঔপনিবেশবাদের মধ্য দিয়ে
ঘ. প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে

২. শিল্পায়ন হচ্ছে:
ক. নগরভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা
খ. স্বল্প পরিসরের উৎপাদন ব্যবস্থা
গ. ব্যক্তিগত উৎপাদন ব্যবস্থা
ঘ. প্রযুক্তিনির্ভর বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থার প্রসার

৩. শিক্ষা ও শিল্পের মধ্যে কী ধরনের সম্পর্ক রয়েছে?
ক. পরিপূরক সম্পর্ক
খ. দ্বন্দ্বমূলক সম্পর্ক
গ. নির্ভরশীলতার সম্পর্ক
ঘ. কোনো সম্পর্ক নেই

উত্তরমালা: ১. খ, ২. ঘ, ৩. ক

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. শিল্পায়নের বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. শিল্পায়ন বলতে কী বুঝায়? এর প্রধান কয়েকটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন।
২. শিল্পায়ন ও শিক্ষার আন্তঃসম্পর্ক ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ ৬.৮: নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী ও শিক্ষা
Ethnic Group and Education

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- নৃগোষ্ঠী বলতে কী বুঝায় তা বলতে পারবেন।
- নৃগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- নৃগোষ্ঠী ও শিক্ষার সাথে তাদের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

ভূমিকা

কোনো দেশ বা জাতির নানারূপ বৈচিত্র্যের মধ্যে নৃগোষ্ঠী অন্যতম। সমাজের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, ভারসাম্য ও অগ্রগতি রক্ষায় নৃগোষ্ঠী বা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বের অধিকাংশ দেশেই বৃহৎ জাতিগোষ্ঠীর পাশাপাশি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অবস্থান পরিলক্ষিত হয়। ঐতিহ্যবাহী পেশা, পৃথক সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ এবং বসবাসের নির্দিষ্ট এলাকা এদেরকে বৃহৎ জাতিগোষ্ঠী থেকে স্বাতন্ত্র্য দান করে। অধিকাংশ সময় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষেরা নিরক্ষরতা, দারিদ্র্য, সংস্কারে জর্জরিত থাকে। কখনো কখনো নাগরিক অধিকারের জন্যও এদেরকে সংগ্রাম করতে হয়। বাংলাদেশে বসবাসকারী অধিকাংশ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী শিক্ষাসহ আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে অনগ্রসর। মানসম্মত আধুনিক শিক্ষাই এদের কাঙ্ক্ষিত মুক্তিকে ত্বরান্বিত করতে পারে।

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংজ্ঞা (Definition of Ethnic Group)

সাধারণ অর্থে নৃগোষ্ঠী হচ্ছে এমন একটি জনগোষ্ঠী যাদের একটি স্বতন্ত্র জীবন ব্যবস্থা ও পৃথক সংস্কৃতি রয়েছে। এ সংস্কৃতির দ্বারাই তাদের সনাক্ত করা যায়, পরিচিতি ঘটে। একটি জাতীয় সংস্কৃতির মধ্যে স্বতন্ত্র ভাষা, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যাভ্যাস, ধর্মীয় বিশ্বাস, পেশা, জীবন-যাপন প্রণালী ইত্যাদি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীকে স্বকীয়তা দান করে। অনেকে এদেরকে উপজাতি, আদিবাসী, বর্ণগোষ্ঠী বলেও অভিহিত করে থাকেন। বাংলাদেশের চাকমা, সাঁওতাল, গারো, মনিপুরী, বেদে সম্প্রদায়কে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী বলে অভিহিত করা যায়।

W. P. Scott তাঁর *Dictionary of Sociology*-তে বলেছেন- A group with a common cultural tradition and a sense of identity which exists as a sub-group of larger society. The members of an ethnic group differ with regard to certain cultural characteristics from the other members of their society. They may have their own language and religion as well as certain distinctive customs.

ড. খুরশীদ আলম এর মতে, আভিধানিক অর্থে পৌত্তলিকতাবাদে বিশ্বাসী ধর্মীয় সম্প্রদায়কে এথনিক গ্রুপ বলা হয়। মুসলিম, খ্রিস্টান ও ইহুদী– এ তিনটি ধর্মীয় সম্প্রদায় ছাড়া বাকি সব ধর্মকে এথনিক গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। .... বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীভুক্ত যেসব আদিবাসী সম্প্রদায় আছে তাদেরকে এথনিক গ্রুপ (ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী) বলে আখ্যায়িত করা হচ্ছে।

এএইচএম মোস্তাফিজুর রহমান এবং ড. ইকবাল হুসাইন তাঁদের *সমাজ ও সম্প্রদায়* গ্রন্থে (পৃ. ২৮) বলেছেন,

বর্ণগোষ্ঠী বা নৃগোষ্ঠী হচ্ছে এমন এক জনগোষ্ঠী যাদের একটি নিজস্ব বিশেষ ভাষা ও সংস্কৃতি রয়েছে যা ওই সমাজের অন্যদের থেকে পৃথক। এরা প্রায়শ একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাস করে। এদের মধ্যে রয়েছে গভীর ঐক্য ও সংঘবদ্ধতা, যার ভিত্তিতে তারা একে অন্যের সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। নৃগোষ্ঠীর সদস্যদের জীবনধারা পরিচালিত হয় অভিন্ন সামাজিক আচার-প্রথা, বিশ্বাস, বিচার ব্যবস্থা, রীতিনীতি ও মূল্যবোধ দ্বারা।

উপর্যুক্ত সংজ্ঞাগুলার আলোকে বলা যায়, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী হচ্ছে এমন একটি সম্প্রদায় যাদের নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি, এতিহ্যবাহী পেশা, প্রথা, বিশ্বাস ও মূল্যবোধ রয়েছে। এরা দেশের নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাস করে এবং বৃহৎ জাতিগোষ্ঠীর তুলনায় এরা সংখ্যালঘু। একটি দেশে এক, একাধিক বা অসংখ্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বসবাস থাকতে পারে। বাংলাদেশে মুসলিম কিংবা বাঙালি বৃহৎ জাতিগোষ্ঠী। পক্ষান্তরে সাঁওতাল, গাঁরো, চাকমা, মারমা, মনিপুরী, বেদে, হরিজন, জলদাস প্রভৃতি সম্প্রদায় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী হিসেবে পরিগণিত।

নৃগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Ethnic Group)

আমরা ইতোমধ্যে জেনেছি যে, ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি, সনাতন পেশা, পৃথক ধর্মবিশ্বাস, স্বতন্ত্র ভাষার অধিকারী বিশেষ জনগোষ্ঠীকে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী বলে। তবে শিক্ষা, সচেতনতা, আধুনিকতা, নগরায়ন, শিল্পায়ন ইত্যাদি কারণে নৃগোষ্ঠীর জীবন-যাত্রা এবং সংস্কৃতিতে পরিবর্তন এলেও মৌলিক কিছু বৈশিষ্ট্য এ জনগোষ্ঠীকে স্বাতন্ত্র্য দান করেছে। যেমন–

১. **সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী:** নৃগোষ্ঠীকে প্রায়শ 'ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী' বলে অভিহিত করা হয়। জাতিগোষ্ঠী থেকে নৃগোষ্ঠীর জনসংখ্যা কখনোই বেশি নয়। অনেকটা এ কারণেই ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষদের উপর নানা নিপীড়ন সংঘটিত হয়।

২. **নিজস্ব সংস্কৃতি:** অধিকাংশ নৃগোষ্ঠীর নিজস্ব সংস্কৃতি রয়েছে। এ সংস্কৃতিই তাদেরকে স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয় দান করে। সংস্কৃতির মধ্যে তাদের ভাষা ও যোগাযোগ, ধর্মচর্চা, বিনিময় প্রথা, পেশা, মূল্যবোধ, বিয়ে ও পরিবার ব্যবস্থা, নেতৃত্ব, প্রথা, বিচার ব্যবস্থা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত।

৩. **বৃহৎ সমাজ ও জাতির সাথে সম্পৃক্ত:** অধিকাংশ নৃগোষ্ঠী বৃহৎ সমাজ বা জাতির সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ তারা পরিপূর্ণ স্বাধীন কোনো জাতি নয়; বরং স্বাধীন একটি জাতির সাথে সম্পৃক্ত একটি রাষ্ট্রের স্বাধীন নাগরিক। তারা বৃহত্তর সমাজের একটি অপরিহার্য অংশ।

৪. **নৃগোষ্ঠী মূলত একটি উপ-জাতি:** নৃগোষ্ঠী কোনো রাষ্ট্র বা সমাজের প্রধান জাতি বা দল নয়। তারা মূলত একটি উপ-জাতি বা উপদল (Sub-nation or Sub-group)। বস্তুত বৃহৎ সমাজের বিপরীতে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠী হচ্ছে নৃগোষ্ঠী।

৫. **নির্দিষ্ট ভৌগোলিক পরিসীমায় বসবাস:** নৃগোষ্ঠীর লোকেরা প্রায়শ একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক পরিসীমায় বসবাস করে। ভৌগোলিক নৈকট্য তাদের আন্তঃসম্পর্ক অটুট রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অনেকে যাযাবর জীবন-যাপনে অভ্যস্ত।

৬. **মোটামুটি স্থায়ী:** নৃগোষ্ঠী মোটামুটি স্থায়ী। বংশানুক্রমে যুগ যুগ ধরে এদের সংস্কৃতি টিকে থাকে। পূর্বপুরুষের প্রথা-বিশ্বাস, পেশা ও মূল্যবোধ বংশ পরম্পরায় চলতে থাকে। সেদিক থেকে নৃগোষ্ঠী যেকোনো রাষ্ট্রে মোটামুটি স্থায়ী অধিবাসী।

৭. **ধর্ম, নেতৃত্ব ও সদস্যপদ:** ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর লোকেরা প্রায়শ পৌত্তলিকতা বা পূজা-অর্চনায় বিশ্বাস করে। যদিও সাম্প্রতিককালে ধর্মান্তরিত হওয়ার ঘটনাও পরিলক্ষিত হয়। এখানে গোষ্ঠীর নেতৃত্ব প্রদান করা হয় সনাতন প্রথার ভিত্তিতে। অধিকাংশ সময় বয়োজ্যেষ্ঠতাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। তবে নেতৃত্ব নির্বাচনে দক্ষতা, জ্ঞান, বংশানুক্রমিক প্রথারও রেওয়াজ দেখা যায়। কোনো নৃগোষ্ঠীর সদস্যপদ লাভের একমাত্র উপায় হচ্ছে জন্মসূত্র।

বাংলাদেশের নৃগোষ্ঠী (Ethnic Group in Bangladesh)

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সম্পর্কে কিছু বিতর্ক রয়েছে। বিতর্কের মূলে রয়েছে তাদের পরিচয়। স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও পৃথক সংস্কৃতির বিভিন্ন জনগোষ্ঠী আদিবাসী, উপজাতি, নৃগোষ্ঠী নাকি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী? সরকারিভাবে এদেরকে 'ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী' (Ethnic minority group) বলে অভিহিত করা হয়েছে। তবে নাগরিক সমাজ ও মানবাধিকার সংগঠনগুলো এদেরকে 'আদিবাসী' (Indigenous people) বলে উল্লেখ করেন। আবার অনেকে এদেরকে 'উপজাতি' (Tribe) বলেও মনে করেন। বিতর্কের দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে, বাংলাদেশে মোট কতটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী বা আদিবাসী সম্প্রদায় রয়েছে। সাধারণভাবে বলা হয়, দেশে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংখ্যা ২৫টি। সরকারিভাবে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংখ্যা ৪৫টি বলে উল্লেখ করা হয়। কোনো কোনো বেসরকারি সংস্থার মতে বাংলাদেশে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংখ্যা ৭৫টি। ২০১১ সালের আদশুমারি অনুযায়ী দেশে মোট ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জনসংখ্যা হচ্ছে প্রায় ২৫ লক্ষ, যা মোট জনগোষ্ঠীর ১.৭ শতাংশ।

নৃগোষ্ঠী ও শিক্ষা (Ethnic Group and Education)

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সদস্যরা সনাতন ও এতিহ্যবাহী জীবনধারায় অভ্যস্ত। পূর্বপুরুষের পেশা, বিশ্বাস, প্রথা ও মূল্যবোধের প্রতি অনুরাগী ও শ্রদ্ধাশীল থাকায় তারা পরিবর্তন ও আধুনিকতাকে সহজে গ্রহণ করতে পারে না। অধিকাংশ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ভৌগোলিক দিক থেকে প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাস করে। আর্থ-সামাজিক দিক থেকেও তারা অনগ্রসর। ফলে বেশিরভাগ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী শিক্ষাদীক্ষায় পশ্চাদপদ। শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর পশ্চাদপদতার যেসব কারণ রয়েছে সেগুলো হচ্ছে–

১. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সদস্যরা পরিবর্তন বিমুখ। তারা ঐতিহ্যবাহী পেশা, সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগী এবং সংস্কারে আচ্ছন্ন;
২. দারিদ্র্য এবং আর্থ-সামাজিক অনগ্রসরতা;
৩. নিজস্ব ভাষায় শিক্ষার সুযোগ না থাকা;
৪. প্রত্যন্ত বা দুর্গম এলাকায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকের অভাব;
৫. সচেতনতার অভাব;
৬. সুযোগ ও পৃষ্ঠপোষকতার অভাব;
৭. সামাজিক বৈষম্য, সমাজের প্রভাবশালীদের দ্বারা শোষণ, বঞ্চনা, নিপীড়ন।

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীকে শিক্ষিত করে উন্নয়নের মূলধারায় যুক্ত করতে হলে উপর্যুক্ত কারণগুলো বিবেচনায় নিতে হবে। সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে তাদেরকে পরিবর্তনমুখী করে তুলতে হবে। প্রত্যন্ত ও দুর্গম অঞ্চলে সরকারিভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে সেখানে শিক্ষার সুযোগ অবারিত করা অপরিহার্য। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী এবং স্থানীয়দেরকে অগ্রাধিকার দিয়ে শিক্ষকতায় নিযুক্ত করা হলে তা ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করবে। দরিদ্রদেরকে শিক্ষিত করতে হলে স্কুল ফিডিং, বৃত্তি বা উপবৃত্তি চালু করা অপরিহার্য। শিক্ষার সুফল সম্পর্কে এদের মধ্যে জনসচেতনতা সৃষ্টি করা আবশ্যক। জনপ্রতিনিধি এবং বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর প্রধানদেরকে সম্পৃক্ত করে সবার স্কুলে আসা নিশ্চিত করা যেতে পারে। স্কুলের পাঠ যাতে সহজে বোধগম্য এবং আনন্দদায়ক হয় সে জন্য অবশ্যই বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষায় শিক্ষা ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও সরবরাহ করা জরুরি। নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতির শিক্ষক পেলে তাদের মধ্যে পড়ালেখার বাড়তি আগ্রহ তৈরি হবে। উচ্চশিক্ষায় এবং চাকরিতে ক্ষুদ্রনৃগোষ্ঠীর জন্য কোটা সংরক্ষণ অব্যাহত রাখা প্রয়োজন। এছাড়া তাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে অক্ষুণ্ন রাখতে উপযোগী বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা উচিত। কেবল চাকরি-বাকরি বা শহরমুখী হওয়া নয়; শিক্ষিত হয়েও যাতে স্থানীয়ভাবে উপযুক্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয় সেবিষয়ে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগকে আরো শক্তিশালী করা দরকার।

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সদস্যদেরকে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শিক্ষককে বিশেষভাবে সচেতন এবং দায়িত্বশীল হওয়া উচিত। তাদের সংস্কৃতি, মূল্যবোধ ও প্রথার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা বাঞ্ছনীয়। আত্মমর্যাদায় আঘাত করে এমন কোনো আচরণ প্রদর্শন, কথা বলা বা কাজ করা থেকে সম্পূর্ণভাবে বিরত থাকতে হবে। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অনগ্রসরতা, পশ্চাদপদতা, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, পরিবার কাঠামো ইত্যাদি বিবেচনায় নিয়ে প্রয়োজনে তাদের প্রতি বিশেষ যত্ন নেয়া যেতে পারে। শ্রেণি পাঠদানে প্রশ্নোত্তর, দলীয় কার্যক্রম এমনকি আসন বিন্যাসেও অনগ্রসর শিক্ষার্থীর প্রতি বাড়তি নজর দেয়া যেকোনো শিক্ষকের অপরিহার্য দায়িত্ব।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৮

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. সরকারিভাবে বাংলাদেশে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংখ্যা কতটি?
ক. ২৫টি
খ. ৪৫টি
গ. ৬০টি
ঘ. ৭৫টি

২. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর লোকেরা সাধারণতঃ
ক. উন্নয়নকামী
খ. উচ্চশিক্ষিত
গ. নগরের অধিবাসী
ঘ. পরিবর্তন বিমুখ

উত্তরমালা: ১. খ, ২. ঘ

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর (এথনিক গ্রুপ) সংজ্ঞা দিন।
২. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্যগুলো লিখুন।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শিক্ষা অর্জনে প্রতিবন্ধকতা এবং তা থেকে উত্তরণের উপায় সম্পর্কে আলোচনা করুন।
২. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করুন। শিক্ষায় তারা কতটা অগ্রগামী আলোচনা করুন।

পাঠ ৬.৯: সংস্কৃতি ও শিক্ষা
Culture and Education

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- সংস্কৃতির ধারণা ব্যক্ত করতে পারবেন।
- শিক্ষার সাথে সংস্কৃতির সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সংস্কৃতি (Culture)

সংস্কৃতি সমাজবিজ্ঞানের একটি ব্যাপক আলোচিত বিষয়। সমাজবিজ্ঞানের আলোচনা সমাজকে ঘিরে। আর সমাজের কেন্দ্রে মানুষের অবস্থান। প্রাণীল মধ্যে মানুষেরই একমাত্র সংস্কৃতি আছে। তাই মানুষের সাথে একমাত্র সংস্কৃতি অত্যন্ত নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। বস্তুত পক্ষে সংস্কৃতি ও সামাজিক সৃষ্টি। সামাজিক সম্পর্কের সংস্কৃতি হচ্ছে সামাজিক সৃষ্টি। সামাজিক সম্পর্কের ভিত্তিতে মানুষের ব্যক্তিগত ও যৌথ ক্রিয়াকর্মের ফলেই সংস্কৃতির উদ্ভব।

সংস্কৃতি হলো সমাজস্থ মানুষের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পরিচয়ের সুস্পষ্ট ইঙ্গিতসহ একটি উপাদান। সত্যিকার অর্থে সংস্কৃতি হলো মানুষের একক বৈশিষ্ট্য, যার মাধ্যমে মানুষ জীব জগতে স্বতন্ত্র মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছে।

সংস্কৃতি মানুষের জীবনধারা। কেননা মানুষের জীবনের প্রতিচ্ছবি ভেসে ওঠে তার সংস্কৃতির মাধ্যমে। মানুষ বেঁচে থাকে তার সংস্কৃতিকে ধারণ করে। পারিবারিক জীবন থেকে জাতীয় জীবন পর্যন্ত মানুষের পরিচিতি ঘটে তার সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে। এক্ষেত্রে বলা যায় “Man dies when his heart fails and a nation dies when its culture dies”. অর্থাৎ মানুষ মৃত্যুবরণ করে যখন তার হৃদয়যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায় এবং একটি জাতির মৃত্যু ঘটে যখন সে তার সংস্কৃতিকে হারিয়ে ফেলে। তাই প্রতিটি জাতিই তার নিজস্ব সংস্কৃতি নিয়ে বিঁচে থাকতে চায়। সংস্কৃতিই কোনো জাতিতে বিশ্ব দরবারে পরিচিত করে।

সংস্কৃতির সংজ্ঞা (Definition of Culture)

‘সংস্কৃতি’ ইংরেজি ‘Culture’ শব্দের বাংলা রূপায়ন। সংস্কৃতি হলো এমন এক মানব গুণ যা নিরন্তর সংস্কারের মাধ্যমে প্রাপ্ত। মানুষের শিক্ষা দীক্ষা, বিচার-বুদ্ধি, আচার-অনুষ্ঠান, রীতি-নীতি ইত্যাদির মার্জিত রূপকেই ‘সংস্কৃতি (Culture)’ বলা হয়। ইংরেজি ‘Culture’ শব্দটি এসেছে ল্যাটিন ‘Colere’ শব্দ থেকে। এর অর্থ ‘কর্ষণ’ বা ‘চাষ’। ইংরেজি Culture শব্দের অর্থ হলো– “The training and refinement of mind, tastes and manners”. অর্থা পরিশীলিত মন, মার্জিত রুচি ও ব্যবহার। অন্যভাবে বলা যায়, সংস্কৃতি হলো অশিক্ষা, অশিষ্টতা, রুক্ষতা ইত্যাদির বিপরীত বিষয়। সাধারণ মানুষের ধারণা সংস্কৃতি মানুষের সুশিক্ষা, সুনীতি, সুআচার, সুরুচি প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য, যা মানুষ ক্রমাগত চর্চার মাধ্যমে অর্জণ করতে পারে। সাধারণ মানুষ মনে করে মানুষ যখন মার্জিত হতে শেখে, মার্জিত রূপের পরিচয় দেয় তখনই কেবল সে সংস্কৃতিবান হয়েছে এ কথা বলা যায়। তবে সাধারণ মানুষের এ ধারণাটি ঠিক নয়। এটি একটি সংকীর্ণ ধারণা। সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সংস্কৃতির এ ধারণাকে মূল্যবোধ নিরপেক্ষ বলা যায় না কোনো ভাবেই।

সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বস্তুত, মানুষের সামাজিক জীবন যাত্রার সবকিছুই মানুষের সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মানুষের কৃষি কাজ থেকে শুরু করে গৃহ নির্মাণ, শিল্প উৎপাদন চারুকলা, প্রথা-পদ্ধতি,

আচার-অনুষ্ঠান, রন্ধন প্রণালী, পোশাক, উৎসব, নন্দন শিল্প, প্রযুক্তি প্রভৃতি সব কিছুই মানুষের সংস্কৃতির অন্তর্গত। তাই বলা যায়, "Culture is the total way of life". অর্থাৎ 'সংস্কৃতি মানুষের সমগ্র জীবনযাত্রা প্রণালী'। আবার সংস্কৃতি বা Culture কে 'A way of life' বা 'একটি জীবন প্রণালীও' বলা যায়। ফলে বলা যায়, সামাজিক জীব হিসেবে সমাজে মানুষ যা কিছু অর্জন করে, অনুশীলন করে, আয়ত্ত করে, তার সব কিছুই সংস্কৃতির সাক্ষ্য করে, আয়ত্ত করে, তার সবকিছুই সংস্কৃতির সাক্ষ্য বহন করে। অর্থাৎ মানুষ যা কিছুই আবিষ্কার করেছে এবং জ্ঞানের সংযোজন ঘটিয়েছে এর সবই সংস্কৃতি। ফলে মানুষের টিকে থাকা জ্ঞানের অগ্রগতি সাধন, সভ্যতার বিকাশ সবকিছুই সংস্কৃতির অবদান ও সংস্কৃতির ওপর নির্ভরশীল। ষোল শতকের শেষার্ধে Francis Bacom 'Culture' শব্দটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন। Culture বা সংস্কৃতি নিয়ে সমাজবিজ্ঞানী ও নৃবিজ্ঞানীরা অনেক আলোচনা করেছেন। বিভিন্ন জন এর সংজ্ঞা নিয়ে বিভিন্ন দিকে আলোকপাত করেছেন। যেমন–

ম্যাকাইভার (MacIver) সংস্কৃতি ও সভ্যতা সম্পর্কে একটি ছোট বাক্যে তাঁর বক্তব্য তুলে ধরেছেন– "Culture is that we are, our civilization is that we use". (The Modern state, P. 325)। অর্থাৎ "আমরা যা সেটাই সংস্কৃতি, আর আমরা যা ব্যবহার করি সেটাই আমাদের সভ্যতা"।

শিক্ষা ও সংস্কৃতি (Education and Culture)

শিক্ষা ও সংস্কৃতি পরস্পর সম্পর্কিত এবং একে অন্যের ওপর স্বত:স্ফূর্ত প্রভাব বিস্তারকারী। এ জন্যেই অনেকে সংস্কৃতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে শিক্ষার কথা বলে থাকেন। তবে সংকীর্ণ অর্থে নয়, ব্যাপক অর্থে শিক্ষা অবশ্যই সংস্কৃতির দ্যোতক। সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকেঞ্জির মতে, উক্ত ব্যাপক বা বৃহত্তর অর্থেই শিক্ষা, সংস্কৃতির সাধারণ পরিচয় বহন করে থাকে। কেবলমাত্র সমাজ জীবনের প্রস্তুতি নয়, শিক্ষা হলো মানব জীবনের পরম লক্ষ্য। অবশ্য সমাজবিজ্ঞানে 'সংস্কৃতি' শব্দটি ব্যাপক অর্থেই ব্যবহৃত হয়। মানুষের শ্রম ও মেধার ভিত্তিতে অর্জিত বৈষয়িক ও মানসিক সম্পদের সমষ্টিই সংস্কৃতি। আর এই অর্জিত বিষয়টিই শিক্ষার সাথে সম্পর্কিত। মানুষ কোনো কিছু না শিখে তা অর্জন করতে পারে না। কোনো কিছু অর্জন করতে হলে তা কীভাবে অর্জন করা যায় তা শেখার বিষয়। মানুষ বৈজ্ঞানিক কলাকৌশল অর্জনের মাধ্যমে তার পার্থিব জীবনের সুখ-সাচ্ছন্দ্যের মানোন্নয়নের স্বার্থে ক্রমাগত নতুন নতুন উপকরণ সৃষ্টি করে চলেছে। এই যে বৈজ্ঞানিক কলাকৌশল অর্জন ও ক্রমাগত নতুন উপকরণ সৃষ্টি, এর সাথে শিক্ষার সম্পর্ক সরাসরি এবং প্রাসঙ্গিক।

গ্রাহাম ওয়ালাসের অভিমতে, "সংস্কৃতি সামাজিক ঐতিহ্য বিশেষ। যা মানুষের চিন্তা-চেতনা, মূল্যবোধ ও বস্তু জগতের সমাহার। এটি শিক্ষার মাধ্যমে পূর্ববর্তি প্রজন্ম থেকে আবর্তিত হয়।

সংস্কৃতির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্যই হলো– সংস্কৃতি শিখতে হয় (Culture is Learned)। পূর্ববর্তী পুরুষের কাছ থেকে পরবর্তী পুরুষের মানুষেরা সংস্কৃতির শিক্ষা গ্রহণ করে। এটি মানুষের জন্মসূত্রে লব্ধ ক্ষমতা নয়। অন্যভাবে বলা যায়, জন্মের পর সমাজের কাছ থেকে সমষ্টিগতভাবে শিক্ষালব্ধ আচরণ এবং একই সাথে নিজ গুণের মাধ্যমে উদ্ভাবিত নতুন নতুন আচরণ ও স্বভাব সবই মানুষের সংস্কৃতির অন্তর্গত হয়। নবজাত শিশুর কোনো সংস্কৃতির ভিত্তি থাকে না। কিন্তু যখন সে তার পরিচিত পরিবেশের অন্যান্য মানুষকে অনুসরণ করে, কোনো সংকেত যেমন ভাষা ব্যবহার শুরু করে বা কোনো অর্থপূর্ণ মিথস্ক্রিয়ায় লিপ্ত হয় তখন সেসব কাজকে শিক্ষালব্ধ সংস্কৃতির অর্ন্তগত বলা যায়। সংস্কৃতি যেমন শেখার বিষয় তেমনি শিক্ষাও সংস্কৃতিকে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে প্রবহমান রাখে, গতিশীল রাখে।

সংস্কৃতির মাধ্যমে সমাজবদ্ধ মানুষ সেই সমাজের আচার-আচরণ ও রীতি-নীতির একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি বা ধারা শিক্ষা লাভ করে সচ্ছন্দে জটিল অবস্থার মুখোমুখি হতে সক্ষম হয়। সমাজ জীবনে মানুষের বিভিন্ন ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় বা হতে পারে। সুস্থ স্বাভাবিক সমাজ জীবনের প্রয়োজনে অনেক সময় সমাজের মানুষকে বিভিন্ন

পরিস্থিতির সন্তোষজনক মোকাবেলা করা প্রয়োজন হয়ে যায়। এর জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি ও সামর্থ সংস্কৃতির মাধ্যমেই ব্যক্তি পেয়ে থাকে। সামাজিক ক্ষেত্রে সৃষ্ট বিভিন্ন জটিল পরিস্থিতি ও সমস্যার সমাধান সংস্কৃতির মাধ্যমেই পাওয়া যায়। ব্যক্তি সংস্কৃতির মাধ্যমে কোথায়, কী অবস্থায়, কখন কী করতে হবে বা কী করতে হবে না প্রভৃতি বিষয় পূর্ব থেকেই জানতে পারে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় কেউ যদি বাসের টিকেট কিনতে গিয়ে দেখে যে প্রচন্ড ভিড় তখন সে লাইনে দাঁড়িয়ে যায়। ফলে কোনো বিশৃঙ্খলা হয় না। এই যে লাইনে দাঁড়াতে হবে এটি ব্যক্তি সমাজ থেকে শিখেছে এটি তার অর্জিত আচরণ যা সংস্কৃতি হিসেবেই গণ্য।

সংস্কৃতি ব্যক্তিকে উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করে যথার্থ সামাজিক জীবে পরিণত করে। ফলে ব্যক্তি যথার্থ মানুষ হিসেবে আত্মপ্রকাশক করতে পারে। কোনো ব্যক্তিকে যদি সমাজ ও সংস্কৃতির পরিমন্ডলের বাইরে রাখা হয় তবে তার পক্ষে প্রকৃত মানুষ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করা সম্ভব হয় না। সামাজিক জীব হিসেবে ব্যক্তিকে সমাজবদ্ধ জীবন যাপন করার জন্য কিছু যোগ্যতা ও গুণাবলি অর্জন করতে হয়। আর সংস্কৃতির মাধ্যমেই ব্যকিত্ সেসব প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও গুণাবলি অর্জন করে অর্থাৎ শিক্ষা লাভ করে। ব্যক্তিকে যথার্থ ও সভ্য মানুষ হিসেবে সামাজিক স্বীকৃতি ও পরিচিতি পাবার জন্য আবশ্যই সংস্কৃতির পরিমন্ডলের মধ্যে বসবাস করতে হয়। সংস্কৃতিই ব্যক্তিকে শিক্ষাদান করে একটি সভ্য, পরিপূর্ণ ও আদর্শ জীবন গঠনের। সমাজ জীবনের বিভিন্ন বিষয়ে যেমন– পোশাক-পরিচ্ছদ, রীতি-নীতি, আচার-আচরণ, খাদ্যাভ্যাস প্রভৃতি বিষয়ে সংস্কৃতির মাধ্যমেই ব্যক্তি শিক্ষিত হয়ে ওঠে। ব্যক্তি মানুষের আচার-আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে তাকে গোষ্ঠী জীবনের উপযোগী করে তোলে সংস্কৃতি। মূলত ব্যক্তিকে সভ্য মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে সংস্কৃতি।

শিক্ষা একটি বিশেষ সাংস্কৃতিক উপাদান সমাজ পরিবর্তনের জন্য। যে জাতি যত শিক্ষিত যে জাতি তত সংস্কৃতিবান। জ্ঞান বিজ্ঞানের ফলে পরিবর্তিন হয় যায় মানুষের জীবন প্রণালী। পুরনো জীবন ও নানা কুসংস্কার ত্যাগ করে মানুষ ক্রমাগত উন্নত জীবনের দিকে ধাবিত হয়, সমাজ কাঙ্খিত পথে চলতে শেখে। প্রকৃত শিক্ষার মধ্যে গোঁড়ামি ও অহংকারবোধ থাকে না। ফলে উদার, রুচিবোধ সম্পন্ন, প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষের আচার-ব্যবহার অন্যদেরকেও আকৃষ্ট করে। অন্যরাও তার আচার ব্যবহার দেখে শেখে, সংস্কৃতিবান হয়ে ওঠে। আবার শিক্ষার উদ্দেশ্যে মানুষ এক দেশ থেকে অন্য দেশে স্থানান্তর গমন করে। ফলে ব্যক্তির নিজ সংস্কৃতির সাথে ওই দেশেল সংস্কৃতির পরিচয় ঘটে। একে অন্যের সংস্কৃতি দেখে শেখে, উভয় সংস্কৃতির আদান-প্রদান ও সংমিশ্রণ হয়। ফলে মিশ্র সংস্কৃতিরও সৃষ্টি হয়। আর সে কারণেই সাংস্কৃতিক বৈচিত্র দেখা যায়।

শিক্ষার সাংস্কৃতিক লক্ষ্য থাকে। শিক্ষার সাংস্কৃতিক লক্ষ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীকে মার্জিত ও রুচিশীল করা এবং সুন্দর ও সত্যের অনুরাগী করে গড়ে তোলা। নিউম্যানের মতে, সাংস্কৃতিক লক্ষ্য মার্জিত শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা স্বাধীনতাবোধ, সাম্যভাব, শান্ত স্বভাব, মার্জিত আচরণ এবং প্রজ্ঞার অধিকারী হয়। তাঁর মতে, এ ধরনের শিক্ষার অধিকারী ব্যক্তির জীবনযাত্রার প্রতিটি পদক্ষেপ হয় সুন্দর ও রুচিশীল।

বস্তুত, সংস্কৃতি একটি ব্যাপক অর্থ বহনকারী সামাজিক প্রপঞ্চ। জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ, নৈতিকতা ইত্যাদি দিকও সংস্কৃতির অন্তর্গত। সংস্কৃতি লক্ষ্য মূখীর শিক্ষার প্রবক্তারা ব্যক্তির মধ্যে এসব গুণের বিকাশ সাধন এবং ব্যক্তির আচরণে উক্ত গুণের প্রকাশ ঘটানোর ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। হোয়াইটহেডও শিক্ষার সংস্কৃতিমূলক উদ্দেশ্যের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আবার অনেক শিক্ষা চিন্তাবিদ ব্যক্তির সুস্থ স্বাভাবিক জীবন যাপনের জন্য দৈহিক, মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক বিকাশের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক বিকাশ সাধনকেও শিক্ষার লক্ষ্য হিসেবে গণ্য করেছেন। তাঁদের মতে, এসবই হচ্ছে শিক্ষার 'পূর্ণাঙ্গ জীবন যাপন প্রণালী তাই সাংস্কৃতিক বিকাশই পারে শিক্ষার 'পূর্ণাঙ্গ জীবনযাপনমূলক লক্ষ্য' হিসেবে কাজ করতে এবং ব্যক্তির শিক্ষা জীবন সমৃদ্ধ করতে। এভাবেই শিক্ষা ও সংস্কৃতি পরস্পর সংশ্লিষ্ট থেকে একে অন্যের ওপর ক্রিয়া করে এবং একে অন্যকে প্রভাবিত করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৯

ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. সমাজ বিজ্ঞানের আলোচনা কাকে ঘিরে?
ক. সমাজকে ঘিরে
খ. পরিবারকে ঘিরে
গ. রাষ্ট্রকে ঘিরে
ঘ. সবগুলোই

২. যে জাতি যত বেশী শিক্ষিত সে জাতি ততবেশি–
ক. সংস্কৃতিবান
খ. মর্যাদাবান
গ. বুদ্ধিমান
ঘ. মূল্যবান

৩. সংস্কৃতি ব্যক্তিকে উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করে কিসে পরিণত করে?
ক. মর্যাদাবান
খ. সুনাগরিকরূপে
গ. সামাজিকভাবে
ঘ. শিক্ষিত জীবে

উত্তরমালাঃ ১. ঘ, ২. ক, ৩. গ

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. সংস্কৃতি কী?
২. সংস্কৃতি সম্পর্কে ম্যাকাইভারের সংজ্ঞাটি উল্লেখ করুন।
৩. মার্কসীয় ধারণায় সংস্কৃতি কী?
৪. শিক্ষার সাংস্কৃতিক লক্ষ্য কাকে বলে।

গ. রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১. সংস্কৃতিক বলতে কী বোঝায়– ব্যাখ্যা করুন। সংস্কৃতির পাঁচটি সংজ্ঞা প্রদান করুন।
২. সংস্কৃতির সংজ্ঞা দিন। শিক্ষা ও সংস্কৃতির সম্পর্ক বর্ণনা করুণ।

পাঠ ৬.১০: নৈতিক মূল্য ও সামাজিক মূল্যবোধ, সামাজিক আদর্শ, মনোভাব ও শিক্ষা

Morals and Social Values, Norms, Attitudes and Education

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- নৈতিকমূল্য কী তা বলতে পারবেন।
- সামাজিক মূল্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- সামাজিক আদর্শ কী তা উল্লেখ করতে পারবেন।
- শিক্ষার সামাজিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

নৈতিক মূল্য

নৈতিক মূল্য, সামাজিক মূল্য, সামাজিক মনোভাব, নিয়মনীতি ও সামাজিক আদর্শের সাথে শিক্ষার একটি ঘনিষ্ট সম্পর্ক ও যোগাযোগ রয়েছে। শিক্ষাকে সফল শিক্ষা বা প্রকৃত অর্থে শিক্ষা বলা যায় তখনই যখন তার মাধ্যমে শুধু জ্ঞান অর্জন নয়, বরং শিক্ষার্থীর মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধ ও সামাজিক মূল্যবোধের বহি:প্রকাশ ঘটে তার আচরনের মধ্য দিয়ে এবং ফলে একটি স্থায়ী পরিবর্তন তার আচরনের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। শিক্ষার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়– শিক্ষা হলে আচরণের কাঙ্খিত বা ইতিবাচক স্থায়ী পরিবর্তন। সমাজের ভিত্তি পরিবার, আর পরিবার থেকে মানুষ কিছু নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ আত্মস্থ করে। এরপর বয়োবৃদ্ধির সাথে সাথে সমাজের ভেতরেই যে শিক্ষা গ্রহণ করে। তার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাকে নৈতিক ও সামাজিক মূল্যগুলো পূর্ণাঙ্গ আদর্শ মানুষে পরিণত করে। কাজেই শিক্ষার সাথে নৈতিকমূল্য, সামাজিক মূল্য, সামাজিক আদর্শ, সামাজিক মনোভাব– এ সবের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। কাজেই বিষয়গুলো সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকা দরকার।

মূল্যের প্রকৃতি (Nature of Value)

আমরা দৈনন্দিন জীবনে মূল্য শব্দটিকে যেভাবেই ব্যবহার করি না কেন দর্শনে এ শব্দটির বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। মূল্যের স্বরূপ নিয়ে দার্শনিকদের মধ্যে মতভেদ থাকলেই দর্শনের যে শাখাটি মূল্য নিয়ে আলোচনা করে তাকে মূল্যবিদ্যা (Axiology) বলা হয়। মূল্যের অর্থ, স্বরূপ ও শ্রেণি নিয়ে মূল্যবিদ্যা আলোচনা করে। বাস্তববাদী দার্শনিকগণ মূল্যকে বস্তুগত বলে মনে করেন পক্ষান্তরে ভাববাদীগণ মূল্যকে আত্মগত বা বিষয়ীগত বলে মনে করেন। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করলে মূল্য আসলে আত্মগত ও বস্তুগত উভয়ই। মানুষের মনই যেহেতু বস্তুর মূল্যকে নির্ণয় করে বা মূল্যবোধকরণের কাজটি মন কর্তৃক হয় সে কারণে মূল্য আত্মগত। আবার কোন বস্তুকে মূল্য থাকে বলেই আমরা মূল্য নির্ণয় করতে পারি। এ কারণে মূল্য বস্তুগত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, রবীন্দ্রনাথ তার সঙ্গীত ও কাব্যে তার ব্যক্তিগত অনুভূতি প্রকাশ করলেও তার সঙ্গীতের নিজস্ব একটি মূল্য রয়েছে যা আমাদের সবাইকে পরিতৃপ্ত করে। সে কারণে তাঁর অনুভূতি ব্যক্তিগত হলেও বস্তুগত। আর এভাবেই মূল্যকে কেবল ব্যক্তিগত বা শুধু বস্তুগত বলা যায় না এবং তা ব্যক্তিগত হয়েও বস্তুগত হতে পারে, বা বস্তুগত হলেও

ব্যক্তিগত। স্যামুয়েল আলেকজান্ডার মূল্যকে আত্মগত ও বস্তুগত বলে ব্যাখ্যা করেন। বিভিন্ন নীতির উপর ভিত্তি করে মূল্যকে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। এখন আমরা নৈতিক মূল্য কী তা ব্যাখ্যা করব।

নৈতিক মূল্য (Moral Values)

দৈনন্দিন জীবনে আমরা মূল্য শব্দটিকে ভাল ও মন্দ, নৈতিক ও অনৈতিকসহ আরো অনেক ক্ষেত্রেই ব্যবহার করি। নৈতিক মূল্যকে অন্যান্য মূল্যের সাথে গুলিয়ে ফেলা যাবে না। নৈতিকমূল্যকে বুঝতে হলে অনৈতিকমূল্যকে আগে বুঝতে হবে। অর্থনীতিতে যে মূল্যের কথা বলা হয় তা অর্থনৈতিক মূল্য। টাকা-পয়সার বিনিময়ে আমরা পণ্য ক্রয়-বিক্রিয় করি এটাকে বলা হয় বিনিময় মূল্য। সুন্দর ছবি, গান, নৃত্য, কবিতা-নাটক প্রভৃতির রয়েছে নান্দনিক মূল্য। আবার মন্দির, গীর্জা, মসজিদ এ সবের রয়েছে ধর্মীয় মূল্য। উল্লেখ্য এসব মূল্যের নৈতিক কোন মূল্য নেই, এদের রয়েছে নীতি নিরপেক্ষ মূল্য। আর এসব মূল্যকেই বলা হয় অনৈতিক মূল্য। এখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে নৈতিক মূল্য বলতে তা হলে কী বুঝায়? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, যে সকল কাজ মানুষ স্বত:স্ফুর্তভাবে স্বেচ্ছায় সচেতনভাবে করে থাকে, যে কাজে তার পূর্ণ স্বাধীনতা আছে যে সে কোন কাজটি করবে এবং যে কাজের ওপরে আমরা ভাল-মন্দ বা উচিত অনুচিত শব্দগুলো প্রয়োগ করতে পারি তাকেই বলে নৈতিক কর্ম। আর নৈতিক কর্মের কেবল নৈতিক মূল্য রয়েছে। নৈতিক কাজ কখনোই আকস্মিকভাবে বা কোন কিছু দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মানুষ করে না। বরং কেন না কোন নীতিই কাজের চালিকা শক্তিরূপে কাজ করে। আর সেদিক থেকে কেবলমাত্র স্বেচ্ছা প্রণোদিত কর্মই নৈতিক মূল্যের অধিকারী। যেমন, একজন অনাহারীকে কেউ অন্ন দান করল এ কাজটির নৈতিক মূল্য আছে। কেননা, কাজটি স্বেচ্ছা প্রণোদিত।

সামাজিক মূল্য (Social Values)

কোন কাজের ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ, উচিত-অনুচিত বিধেয় দ্বারা মানুষের যে আচরণগুলো মূল্যায়ন করা হয় সে কাজের নৈতিক মূল্য আছে বলতে হবে। কিন্তু নৈতিক মূল্য আর সামাজিক মূল্য দুটো একই ধরনের বিষয় নয়। নৈতিক মূল্য নিরূপনের জন্য নৈতিক অনুমোদন প্রয়োজন হয় এবং সামাজিক মূল্যের ক্ষেত্রে সামাজিক অনুমোদন প্রয়োজন হয়। নৈতিক অনুমোদন ব্যক্তি তার নিজের কাছ থেকেই পেয়ে থাকে এবং ফলে এটা ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ বা নিজস্ব ব্যাপার। কিন্তু সামাজিক মূল্য বাইরের শক্তি, কেননা সামাজিক অনুমোদন বাইরে থেকে ব্যক্তির ওপর চাপানো হয়। যেমন– মদ পান না করা, ব্যভিচার না করা, উপযুক্ত সময়ে সন্তাদের বিয়ে দেয়া ইত্যাদি সামাজিক মূল্যেল আওতায় পড়ে। আর এসব প্রথা, রীতি-নীতি বা বিধি-নিষেধ বিভিন্ন সমাজে বিভিন্নভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে, ফলে সমাজভেদে সামাজিক মূল্যবোধগুলোও বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। আর এসব সামাজিক মূল্যের লঙ্গন নৈতিক মূল্যের লঙ্গন নয়। নৈতিকতা তার স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র নিয়ে সব যুগে সব সমাজেই সমাদৃত হয়ে থাকে। ঠিক একইভাবে নৈতিক দায়িত্বোধ ও সামাজিক দায়িত্বোধ এক নয়। নৈতিক দায়িত্ববোধের উৎস নৈতিক মূল্যবোধ, আর সামাজিক দায়িত্ব সমাজের প্রয়োজনে উদ্ভূত হয়।

সামাজিক আদর্শ, নিয়মনীতি ও মনোভাবের সাথে শিক্ষার সম্পর্ক

শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসুন প্রথমে আমরা সামাজিক আদর্শ, নিয়মনীতি ও মনোভাব (Attitudes) বলতে কী বুঝায় তা জেনে নেই। আদর্শ বলতে কী বোঝায়? আদর্শ হল জীবনের লক্ষ্য যাকে আমরা লাভ করতে চাই। প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনেই কোন না কোন আদর্শ থাকে যাকে কেন্দ্র করে সে জীবনে চলার অনুপ্রেরণা পায়। আর এই আদর্শকে সামনে রেখেই একটি নির্দিষ্ট গতিপথে সে অগ্রসর হয়। ব্যক্তির জীবনের এই পরিবর্তন উদ্দেশ্যহীন নয়, তার অগ্রগতি ও উন্নয়ন ও আদর্শের উপরেই নির্ভরশীল। ব্যক্তির জীবনে যা সত্য, সমাজ জীবনেও তা সত্য ব্যক্তির জীবনের ন্যায় সমাজ জীবনেরও পরিবর্তন আছে, আছে অগ্রগতি, কাজেই সমাজ জীবনের সেই পরিবর্তন উদ্দেশ্যহীন নয়। সমাজ ও একটি আদর্শকে লক্ষ্য হিসেবে নিয়ে নির্দিষ্ট গতি পথে অগ্রসর হয়। ব্যক্তি তার জীবনের

আদর্শ বিচার বুদ্ধির দ্বারা নির্ধারণ করে। সমাজ জীবনের আদর্শও নির্দিষ্ট হয় মানুষের বিচার বুদ্ধির দ্বারাই সামাজিক আদর্শ নিয়ে সমাজ বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও প্রধানত: যে কয়টি আর্দশের নাম আমরা উল্লেখ করতে পারি তা হলো– (১) অভিজাততান্ত্রিক আদর্শ (২) গণতান্ত্রিক আদর্শ (৩) সমাজতান্ত্রিবাদ ও (৪) নৈরাজ্যবাদ।

এ আদর্শগুলোর কোন না কোন একটিকে সামনে রেখেই সমাজের পরিবর্তন ও অগ্রগতি সাধিত হয়। তবে সামাজিক আদর্শ বাস্তবায়নের বিষয়ে ব্যক্তির ভূমিকার চেয়ে রাষ্ট্রের সংশ্লিষ্টতাই বেশী থাকে। এ কারণেই ম্যাকেঞ্জি বলেন, যে সমস্ত আদর্শকে সামনে রেখে সমাজ অগ্রসর হয়, সেই সমস্ত আদর্শ আংশিকভাবে শাসন ব্যবস্থার সাথেই সংশ্লিষ্ট। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, সামাজিক আদর্শ বাস্তবায়নে ব্যক্তির সাথে সাথে রাষ্ট্রের বিশাল ভূমিকা রয়েছে। আর এ সবকিছুকে পূর্ণতা দান করে শিক্ষা।

মানুষ একই সাথে পরিবার, সমাজ বা রাষ্ট্র এবং বৃহত্তর মানব সমাজ বা আন্তর্জাতিক সমাজের সদস্য। মানুষের সমগ্র শিক্ষা জীবনও এ তিনটি স্তরে পরিব্যাপ্ত। পরিবার থেকেই ব্যক্তির প্রথম শিক্ষা শুরু হয় তা আমরা সকলেই জানি। পরিবার হচ্ছে সমাজের অন্যতম প্রধান প্রতিষ্ঠান ও কেন্দ্রবিন্দু। পরিবারের গন্ডি পেরিয়ে ব্যক্তি যদি বৃহত্তর সমাজ জীবনের স্বার্থে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে সে জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত শিক্ষা। তাই শিক্ষার উদ্দেশ্য এমন হওয়া উচিত যেন ব্যক্তি সামাজিক আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে তার ব্যক্তিগত কর্ম তৎপরতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং ব্যক্তিগত স্বার্থ ও পারিবারিক স্বার্থের উর্দ্ধে উঠে সামাজিক স্বার্থের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে। আর এটাই সামাজিক মনোভঙ্গি বা মনোভাব (Attitudes)। আর এ মনোভঙ্গি গড়ে তুলতে শিক্ষা (Education)-র ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অনুরাগ, সক্ষমতা, প্রবণতা ও প্রয়োজনের দিকটি অবশ্যই বিবেচনা করা উচিত বলে হিলডা জ্যাবা মনে করেন। ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদীরা মনে করেন ব্যক্তির কল্যাণ সাধনই শিক্ষার লক্ষ্য এবং শিক্ষা ব্যক্তির সুপ্ত আকাংখা, শক্তি, সম্ভাবনা ও বুদ্ধিমত্তাকে বিকশিত করার একটি চলমান প্রক্রিয়া। আর এসব কিছুই সমাজের ভেতরে বাস করলেই কেবল বাস্তবায়ন সম্ভব। কারণ ব্যক্তি সমাজ জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু নয়। ব্যক্তির প্রকৃতি যেমন ব্যক্তিগত, তেমনি সেই প্রকৃতি সমাজগত ও বটে। সুতরাং শিক্ষার দ্বারা ব্যক্তিত্বে যেমন বিকাশ ঘটে তেমনি সমাজ জীবনেরও বিকাশ ঘটে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.১০

ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. মূল্যের অর্থ, স্বরুপ ও শ্রেণি নিয়ে আলোচনা করে সে বিষয়টির নাম হলো–
ক. জ্ঞানবিদ্যা
খ. অধিবিদ্যা
গ. মূল্যবিদ্যা

২. বাস্তববাদী দার্শনিকদের মতে মূল্য হচ্ছে–
ক. বস্তুগত
খ. আত্মগত
গ. উভয়ই

৩. স্যামুয়েল আলেকজান্ডার মনে করেন মূল্য হলো–
  ক. আত্মগত ও বস্তুগত
  খ. আত্মগত
  গ. বস্তুগত
৪. নৈতিক কর্ম বলতে কী বোঝায়?
  ক. স্বেচ্ছা প্রণোদিত কাজ
  খ. অনিচ্ছাকৃত কাজ
  গ. কোন কিছু দ্বারা প্রভাবিত হয়ে করা হয় যে কাজ
৫. সামাজিক আদর্শ হিসেবে কোনটিকে গণ্য করা যায়?
  ক. গণতান্ত্রিক আদর্শ
  খ. সমাজতন্ত্র
  গ. উভয়ই

উত্তরমালা: ১. গ, ২. ক, ৩. ক, ৪. ক, ৫. গ

খ. সংক্ষিপ্তমূলক প্রশ্ন

১. মূল্যের প্রকৃতি নির্ণয় করুন।
২. নৈতিক মূল্য ও সামাজিক মূল্য কীভাবে সম্পৃক্ত?
৩. নৈতিক মূল্য কী বুঝায়?
৪. সামাজিক মূল্য বলতে কী বুঝায়?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. মূল্য বলতে কী বুঝায়? নৈতিক মূল্য ও সামাজিক মূল্য ব্যাখ্যা করুন।
২. নৈতিক মূল্য ও সামাজিক মূল্যের মধ্যে কোন সম্পর্ক আছে কী? নৈতিক মূল্য কীভাবে সামাজিক মূল্য বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে ব্যাখ্যা করুন।
৩. সামাজিক আদর্শ বলতে কী বুঝায়? সামাজিক আদর্শ বাস্তবায়নে শিক্ষার ভূমিকা নির্ণয় করুন।
৪. সামাজিক নিয়মনীতি ও মনোভাবের সাথে শিক্ষা কীভাবে সম্পৃক্ত ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন করুন।

পাঠ ৬.১১

রাষ্ট্র, সরকার, আমলাতন্ত্র এবং শিক্ষা
State, Government, Bureaucracy and Education

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- রাষ্ট্র, সরকার ও আমলাতন্ত্র কী বলতে পারবেন।
- রাষ্ট্র, সরকার, আমলাতন্ত্রের সাথে শিক্ষার সম্পর্ক নিরূপন করতে পারবেন।
- রাষ্ট্রের শিক্ষামূলক কাজ বর্ণনা করতে পারবেন।
- রাষ্ট্রের শিক্ষামূলক কাজ বাস্তবায়নে সরকার ও আমলাতন্ত্রের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

রাষ্ট্র ও সরকার (State of Government)

অসাবধানতার জন্য অনেক সময় রাষ্ট্র ও সরকার এ দুটিকে আমরা এক করে দেখে থাকি। আসলে দুটি ভিন্ন অর্থ বহন করে। রাষ্ট্র হচ্ছে একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। এর রয়েছে ৪টি প্রধান উপাদান– (১) জনসমষ্টি, (২) ভূখন্ড, (৩) সরকার, (৪) সার্বভৌমত্ব। রাষ্ট্র এমন একটি জনসমষ্টি যারা নির্দিষ্ট ভূখন্ডে স্থায়ীভাবে বসবাস করে। একটি সংগঠিত সরকার দ্বারা পরিচালিত হয় এবং সর্বপ্রকার বহি:শত্রুর নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত থাকে। সরকার রাষ্ট্র গঠনের অন্যতম উপাদান। সরকার মূলতঃ রাষ্ট্রের মুখপাত্র হিসেবে দেশ পরিচালনা করে। আর আমলাতন্ত্র বলতে সরকারের ঐসব কর্মকর্তাকে বুঝায় যারা সরবরাহের বিভিন্ন পর্যায়ে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত থেকে সরকারের জনসেবামূলক কাজ বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করে। আমলাতন্ত্রের সদস্যরা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, পেশাদারী, রাজনীতি নিরপেক্ষ এবং রাজনৈতিক নেতৃত্বের অধীনস্থ। বাংলাদেশের বিভিন্ন শিক্ষা দপ্তর এবং মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং প্রধান কর্মকর্তা থেকে শুরু করে বিভিন্ন পর্যায়ে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত কর্মকর্তারা বিভিন্ন অধিদপ্তর, দপ্তরসমূহের স্থায়ী কর্মকর্তাদের নিয়েই হয় শিক্ষা আমলাতন্ত্র (Educational Bureaucracy)। অতএব দেখা যাচ্ছে রাষ্ট্র, সরকার ও আমলাতন্ত্র একই ফিতায় গাঁথা।

রাষ্ট্র জনকল্যাণর্থে বিভিন্ন ধরনের কাজ করে থাকে। রাষ্ট্রের অপরিহার্য কাজের মধ্যে অন্যতম হলো শিক্ষা। প্রাথমিকভাবে নাগরিকদের শিক্ষার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। এজন্য রাষ্ট্র তার নাগরিকদের জন্য বিভিন্ন শিক্ষামূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করে। রাষ্ট্রের শিক্ষার স্বরূপ বা মূল প্রকৃতি কীরূপ হবে তা নির্ভর করে সরকারের ধরনের উপর। কারণ সরকার গণতান্ত্রিক, একনায়কতান্ত্রিক, পুঁজিবাদী, সমাজতান্ত্রিক, এককেন্দ্রিক, যুক্তরাষ্ট্রীয় ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। সরকারের এ প্রকৃতি নির্ধারণ করে এর শিক্ষার ধরন। যেমন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সকল ক্ষমতা জনগণের হাতে সংরক্ষিত থাকে। এতে ব্যক্তি স্বাধীনতা অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ফলে এতে জনগণের প্রত্যাশা, ব্যক্তি স্বাধীনতার সংরক্ষণের বিষয়টি শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রাধান্য পায়। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সবকিছু রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে, ব্যক্তি রাষ্ট্রের ইচ্ছা, অনিচ্ছা অনুযায়ী পরিচালিত হয়। সেখানকার শিক্ষাও রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হয়। আবার এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে শিক্ষার সকল কর্মকান্ড কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকে। বিপরীতে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় দিকগুলো থাকে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকে। প্রদেশ ও স্থানীয় জনগণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

রাষ্ট্রের শিক্ষামূলক দায়িত্ব (Educational Role of State)

সরকারের স্বরূপ রাষ্ট্রের শিক্ষার প্রকৃতি নির্ধারণে ভূমিকা রাখলেও সকল রাষ্ট্র তার শিক্ষার ক্ষেত্রে কিছু সুনির্দিষ্ট কাজ পরিচালনা করে থাকে। আধুনিককালে সরকারের বিভিন্নতা থাকা স্বার্থেও বিশ্বের সকল রাষ্ট্রই এ কাজগুলো করে থাকে। নিচে রাষ্ট্রের শিক্ষামূলক কাজগুলো আলোচনা করা হলো।

১. **শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ:** রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হলো শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ। সমাজ ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার উদ্দেশ্য কী হবে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে কোন কোন গুণের বিকাশ আমরা করতে চাই। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো কোন পথে অগ্রসর হবে সে পথ নির্দেশনা দেওয়ার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। সাধারণত রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি 'সংবিধানে' শিক্ষা সম্পর্কে রাষ্ট্রের এই প্রত্যাশায় উল্লেখ থাকে। সরকার রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে এদিকে লক্ষ্য রেখেই শিক্ষামূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করে। এছাড়া জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের মাধ্যমেও রাষ্ট্র শিক্ষার লক্ষ্য নিয়ন্ত্রণের কাজ করে থাকে।

২. **শিক্ষা পরিচালনা:** রাষ্ট্রের দায়িত্ব শুধু শিক্ষার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য নির্ণয়ের মধ্যে শেষ হয়ে যায় না। সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য ও ব্যবস্থা করতে হয়। রাষ্ট্র বিভিন্ন পর্যায়ের নাগরিকদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে। ভৌত সুযোগ সুবিধা দেয়, আর্থিক সাহায্য প্রদান করে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে শিক্ষা পরিচালনা করতে সাহায্য করে, প্রয়োজনীয় শিক্ষক নিয়োগ করে। শিক্ষক নিয়োগের ন্যূনতম যোগ্যতা নির্ধারণ করে। শিক্ষার মান নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

৩. **শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ:** রাষ্ট্রের সংহতি বজায় রাখতে হলে নাগরিকদেরকে সমান আদর্শে শিক্ষা দিতে হবে। অর্থাৎ বিভিন্ন স্তরের শিক্ষা রাষ্ট্রের সকলের জন্য সমান হওয়া দরকার। সেই জন্য রাষ্ট্র বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার পর্যায়/মেয়াদ নির্ধারণ করে। কোন স্তরের শেষে শিক্ষার্থীরা কোন ধরনের স্ট্যান্ডার্ড অর্জন করবে কী ধরনের সার্টিফিকেট পাবে তা নির্বাচন করে। বিভিন্ন স্তরের শিক্ষাক্রম, মূল্যায়ন পদ্ধতি, শিক্ষা প্রক্রিয়া ইত্যাদি নির্ধারণ করে।

৪. **শিক্ষার বাস্তবায়ন নিয়ন্ত্রণ:** রাষ্ট্র শিক্ষার মাধ্যমে জাতীয় সংগতি প্রতিষ্ঠা ও জাতীয় উন্নয়নের জন্য শিক্ষার বাস্তবায়ন নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে রাষ্ট্র সমগ্র দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে। রাষ্ট্র যেমন একদিকে শিক্ষার আর্থিক দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করে। তেমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো নির্দিষ্ট পথে পরিচালতি হচ্ছে কিনা, তা দেখার দায়িত্ব রাষ্ট্রের।

৫. **শিক্ষার আর্থিক দায় দায়িত্ব পালন:** শিক্ষার আর্থিক দায়িত্ব পালন রাষ্ট্রের অন্যতম কাজ। রাষ্ট্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, ভৌত সুবিধা সৃষ্টি, শিক্ষকদের বেতন, শিক্ষার উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মকান্ড পরিচালনার মত প্রধান দায়-দায়িত্ব সরকারের। রাষ্ট্র প্রতি বছরের বাজেট শিক্ষা খাতের জন্য নির্দিষ্ট আর্থিক বরাদ্দ রাখার মাধ্যমে এ কাজটি করে থাকে। এছাড়া বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে আর্থিক অনুদান ও ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে রাষ্ট্র তার আর্থিক দায়িত্ব পালন করে।

৬. **শিক্ষামূলক গবেষণা:** সমাজের গতিশীলতার সঙ্গে তাল রাখার জন্য রাষ্ট্রকে শিক্ষা সংক্রান্ত গবেষণার কাজ হাতে নিতে হয়। এজন্য দেশে বিভিন্ন ধরনের গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে গবেষণার কাজ পরিচালনা করা হয়। এ গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো শিক্ষা নিয়ে বিভিন্ন ধরনের গবেষণা পরিচালনার মাধ্যমে শিক্ষার মান উন্নয়ন ও আধুনিকায়নের প্রয়োজনীয় সুপারিশ করে। রাষ্ট্র সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার গতিশীলতা প্রকাশ করে।

৭. **শিক্ষার সংস্থাগুলোর পেশাগত সামর্থ্যের উন্নয়ন:** রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্তর ও শাখার শিক্ষা বাস্তবায়নের জন্য থাকে বহু সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারী। মূলত এদের পেশাদারীত্ব ও দক্ষতার উপর নির্ভর করে শিক্ষার বাস্তবায়নের সফলতা এবং মান। রাষ্ট্র তাদের পেশাদারীত্ব ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন ধরনের ক্যাপাসিটি বিল্ডিং কর্মসূচি

গ্রহণ করে। শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রদান করে। বিভিন্ন ধরনের সেমিনার, আলোচনা ও মতবিনিময় সভা করে থাকে।

৮. **শিক্ষার মানোন্নয়নঃ** শিক্ষার মান কোন স্থবির বিষয় নয়। বরং এর ধারাবাহিক উন্নয়ন, পরিমার্জন ও পরিবর্তন প্রয়োজন। বিশেষ করে সমাজের পরিবর্তনশীলতার সাথে খাপ খাইয়ে চলার জন্য শিক্ষার পরিবর্তন প্রয়োজন হয়। শিক্ষার এজেন্ট হিসেবে এটি রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব। এ লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা কমিশন, কমিটি গঠন করে বিদ্যমান শিক্ষা পর্যালোচনা ও পরিবর্তন ও মানোন্নয়নের প্রয়োজনীয় পথ নির্দেশনা গ্রহণ করে। বিভিন্ন সংস্থা গঠনের ও প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার এই পরিবর্তন আনার প্রচেষ্টাকে আনুষ্ঠানিক রূপ দেয় এবং শিক্ষাকে পুনর্বিন্যাস করে।

সুতরাং আধুনিক রাষ্ট্রের শিক্ষার দায়িত্ব ব্যাপক। যদিও রাষ্ট্রকে শিক্ষার পরোক্ষ সংস্থা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অস্বত্ত্বেও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় রাষ্ট্রকে শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে কাজ করতে হয়। রাষ্ট্র যদি শিক্ষার ব্যাপারে সক্রিয় না হয়, তবে কল্যাণময় রাষ্ট্র স্থাপন করা সম্ভব ন। এছাড়া রাষ্ট্রের নাগরিকদের যৌক্তিক, নৈতিক ও দৈহিক বিকাশ যদি ঠিকভাবে না হয়, তবে রাষ্ট্রের নিরাপত্তাই বিঘ্নিত হবে। তাই রাষ্ট্রকে শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তি জীবনের বিভিন্ন দিকের উন্নয়ন ঘটাতে হবে। ব্যক্তি যদি অন্ধকারে থাকে তবে রাষ্ট্রের কোন উন্নয়ন পরিকল্পনা স্বার্থক রূপায়ন সম্ভব নয়। তাই আধুনিক রাষ্ট্রের প্রধান কর্তব্য হয়ে এর শিক্ষা ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করা।

রাষ্ট্রের এই ব্যাপক শিক্ষামূলক কর্মসূচি বাস্তবায়নের দায়িত্ব সরকারের, কারণ সরকার হবে রাষ্ট্রের মুখপাত্র। সরকারের কোটামতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় থাকে যাদের প্রত্যেকের সুনির্দিষ্ট কর্ম পরিধি পাচ্ছে। রাষ্ট্রের শিক্ষামূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়নের সকল দায়িত্ব শিক্ষা মন্ত্রণালয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মূল কেন্দ্র হচ্ছে সচিবালয়। সচিবালয় থেকে মাঠ পর্যায়ের শেষ ধাপ পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে বিভিন্ন বাস্তবায়নকারী সংস্থা। এগুলোর প্রতিটিতে বিভিন্ন পদসোপানে রয়েছে বিভিন্ন কর্মকর্তা ও কর্মচারী থাকায় সকলেরই রয়েছে সুনির্দিষ্ট কর্ম পরিধি। এই নির্দিষ্ট কর্মপরিধির আওতায় সম্পাদিত সকলের কর্মকান্ডের মাধ্যমেই রাষ্ট্রের শিক্ষামূলক দায়-দায়িত্ব পালিত হয়ে থাকে।

রাষ্ট্রের মুখপাত্র হিসেবে সরকার ও আরও বেশ কিছু দায় দায়িত্ব পালন করে থাকে। যেমন নতুন নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করে, শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করে। নাগরিকদের শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ভর্তি ও শিক্ষা সমাপ্তকরণ সম্পর্কিত নীতিমালা ও কার্যপদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ করে। শিক্ষা নীতি প্রণয়ন করে, নেতৃত্ব তৈরি করে। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ নীতি প্রণয়ন করে। বিভিন্ন স্তরের শিক্ষায় জাতীয় পর্যায়, সাক্ষরতায় পর্যায় ইত্যাদি নির্ধারণ করে থাকে। এসব কিছু আধুনিক রাষ্ট্রের কাজ। সরকার রাষ্ট্রের চালিকাশক্তি হিসেবে এসব দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে রাষ্ট্রের শিক্ষামূলক কাজকে বাস্তবরূপ প্রদান করে থাকে।

শিক্ষা ও আমলাতন্ত্র (Education and Bureaucracy)

আধুনিক রাষ্ট্র কল্যাণমূলক রাষ্ট্র। কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের একটি অন্যতম মৌলক লক্ষ্য হচ্ছে শিক্ষা ক্ষেত্রের উন্নতি সাধন। এক্ষেত্রে সরকারের উচ্চ শিক্ষিত, প্রশিক্ষিত এবং অভিজ্ঞ শিক্ষা আমলারা জাতীয় অগ্রগতি অর্জনে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। যেমন–

- শিক্ষা সংক্রান্ত সকল আইন বাস্তবায়ন করেন।
- যদিও আইন পরিষদ শিক্ষা বিষয়ের নীতি নির্ধারণ করেন, তথাপি শিক্ষা আমলারা নীতির খুটিনাটি দিক পর্যালোচনার মাধ্যমে নীতি প্রণয়নে সহায়তা করেন।
- শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ, প্রকাশ এবং সংরক্ষণ করেন।
- শিক্ষা ক্ষেত্রে কর্মরত ব্যক্তিবর্গের পেশাগত ও নৈতিক মূল্যবোধেল ভারসাম্য রক্ষায় কাজ করেন।
- শিক্ষা বিষয়ে নীতি নির্ধারণের কাজে নীতি নির্ধারণকরণে সহায়তা দেন।

- শিক্ষা ক্ষেত্রে পরিবর্তনের এজেন্ট হিসেবে কাজ করেন।
- শিক্ষা ক্ষেত্রে শিক্ষক নিয়োগ, সার্টিফিকেট প্রদান ইত্যাদি কাজকে নিয়ন্ত্রণ করেন।
- শিক্ষক প্রশিক্ষণ, বিশেষত কর্মকালীন প্রশিক্ষণকে নিয়ন্ত্রণ করে।
- শিক্ষার দর্শন ও অনুশীলনকে নিয়ন্ত্রণ করে।
- শিক্ষাক্রম প্রণয়ন এবং পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন ও নির্ধারণ প্রভাব রাখে।

সত্যিকার অর্থে শিক্ষা আমলারা পুরো সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে। মডাক্র ওয়েবারের মতে আমলাতন্ত্রের ৪টি প্রধান বৈশিষ্ট্য আছে। (১) কর্তৃত্বের পদসোপন, (২) সুস্পষ্ট শ্রম বিভাজন, (৩) সুনির্দিষ্ট নিয়মকানুন, (৪) নিরপেক্ষতা। আলাতন্ত্রের এসব বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে শিক্ষা আমলার থাকে তাদের শিক্ষামূলক কর্মকান্ড করে থাকেন এটাই প্রত্যক্ষ। কিন্তু অনেক সময় সেটা সম্ভব হয় না। অনেক সময় আমলাতান্ত্রিক জটিলতা বা লালফিতার দৌড়াত্মে শিক্ষার অনেক কর্মকান্ড সঠিক, সঠিক উপায়ে এবং সঠিক ব্যক্তির দ্বারা করা সম্ভব হয় না যা আমলাতন্ত্রের একটি সীমাবদ্ধতা।

সরকারি আমলা ছাড়াও অনেক সময় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পদসোপনের কারণে সেখানেও আমলাতান্ত্রিক জটিলতা দেখা যায়। এ ধরনের আমলাতন্ত্র সরকারি ও বেসরকারি উভয় প্রতিষ্ঠানেই বিদ্যমান থাকে যারা প্রতিষ্ঠানের নিয়ম প্রণয়ন করে, সে অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানের কাজ পরিচালনা করে। আধুনিক সমাজের সকল আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানেই আমলাতান্ত্রিক হয়ে পড়েছে।

শিক্ষা আমলাতন্ত্রের কিছু ইস্যু

আমলাতন্ত্রের কিছু ভালো গুণ আছে। যেমন– সবার জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি। দক্ষতা বৃদ্ধিতে কাজ করা। মেধার ভিত্তিতে নিয়োগ, নিয়মের ভিত্তিতে পদোন্নতি। কিন্তু শিক্ষার ক্ষেত্রে তা অনেক ক্ষেত্রেই করা সম্ভব হয় না। অনেক প্রয়োজনীয় জিনিস যথাসময়ে ক্রয় বা পাওয়া সম্ভব হয় না। ফলে তড়িৎ পরিবর্তন ও উন্নয়ন বাধাগ্রস্থ হয়। সঠিক লোক নিয়োগ সম্ভব হয় না। সমাজের চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষার পরিবর্তন আনা যায় না। বহুমুখী সমাজে প্রধান/সাংস্কৃতিক দলের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা পায়। ছোট বা ক্ষুদ্র দলের স্বার্থ সেভাবে প্রধান্য পায় না। তারা আমলাতান্ত্রিক কাঠামোর সাথে মানিয়া নিতে বাধ্য হয়। এর ফলে দেখা দেয় অসন্তোষ, কর্মস্পৃহার অভাব। ফলে যদিও বলা হয়ে থাকে আমলাতন্ত্র কর্মদক্ষতা বাড়ায়, সমান সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করে, তথাপি, আমলাতন্ত্রের কারণে শিক্ষার এর অনেক নৈতিবাচক প্রভাব পড়ে। তাই শিক্ষার প্রকৃত উন্নয়ন করতে হয়ে আমলাতন্ত্রকে তার নৈতিবাচক ভূমিকা থেকে বের হয়ে আসতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.১১

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. রাষ্ট্র কোন ধরনের প্রতিষ্টান?
ক. বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান
খ. সামাজিক প্রতিষ্ঠান
গ. রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান
ঘ. সবগুলোই

২. রাষ্ট্রের উপাদান কয়টি?
ক. ৬টি
খ. ৭টি
গ. ৫টি
ঘ. ৪টি

৩. শিক্ষা ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের প্রধান ভূমিকা কোনটি?
ক. শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ করা
খ. শিক্ষার ব্যয় নির্বাহ করা
গ. শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা
ঘ. সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করা

উত্তরমালাঃ ১. গ, ২. ঘ, ৩. ক

খ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. আমলাতন্ত্র বলতে কী বুঝায়? রাষ্ট্র ও সরকারের সাথে এটা কীভাবে সম্পৃক্ত ব্যাখ্যা করুন।
২. রাষ্ট্রের শিক্ষামূলক দায়িত্বগুলো সম্পর্কে আলোচনা করুন।
৩. শিক্ষাকে আমলাতন্ত্র কীভাবে প্রভাবিত করে ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ ৬.১২: অর্থনীতি ও শিক্ষা: চাহিদা-যোগান ও সামাজিক প্রেক্ষিতে শিক্ষার ব্যয়

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- শিক্ষার চাহিদা ও যোগান কিভাবে নির্ধারিত হয় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- শিক্ষার সাথে অর্থনীতির পারস্পরিক সম্পর্ক বর্ণনা করতে পারবেন।
- অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিক্ষার ভূমিকা ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- সামাজিক বিনিয়োগ হিসাবে শিক্ষা কিভাবে অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখে তা বর্ণনা পারবেন।

ভূমিকা

শিক্ষাব্যবস্থাই একটি দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষিত মানব সম্পদ তৈরি করে। তাই শিক্ষাখাত দেশের বৃহত্তম শিল্পখাতে পরিণত হয়েছে। পৃথিবীতে যেকোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রবৃদ্ধি এমনকি সামাজিক বিকাশ একান্তভাবে শিক্ষা প্রসারের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর সভ্যতার প্রাণই হল শিক্ষা এবাং শিক্ষার বাস্তবায়ন।

শিক্ষার চাহিদা ও যোগান

শিক্ষার চাহিদা নিহিত শিক্ষার বিনিয়োগ মূল্যে। শিক্ষার বিনিয়োগ মূল্য মূলধন বিনিয়োগের তুলনায় অধিক লাভজনক। অর্থ সব অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ভিত্তি। অর্থ ছাড়া কোন প্রকার উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সফল হতে পারে না। শিক্ষা সম্প্রসারণে প্রধান প্রয়োজন অর্থ। শিক্ষার সাথে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের গভীর সম্পর্ক। বাজার অর্থনীতিতে ব্যবহৃত পদ্ধতি ও কলাকৌশল শিক্ষার চাহিদা ও যোগান নির্ধারণের জন্য ব্যবহার করা সম্ভব। তবে শিক্ষা একমাত্র বাজার অর্থনীতির সূত্র ও নীতিমালা দ্বারা নিয়োজিত হয় না। শিক্ষা চাহিদা ও যোগানের ভিত্তিতে নির্ধারিত মূল্যে কেনা বেচাও হয়না। বরঞ্চ শিক্ষা প্রধানত: সরকারি ও মানব হিতৈষী প্রতিষ্ঠানের অর্থানুকূল্যে পরিচালিত ও পরিবেশিত হয়। শিক্ষার সরবরাহ তাই অর্থনৈতিক নীতিমালার বাইরেও ঘটে।

শিক্ষার চাহিদা সর্বত্র। শিক্ষার চাহিদা অপেক্ষা যোগানের দিকটি অধিকতর জটিল এবং ধোয়াসা। শিক্ষার স্তর, শিক্ষার প্রকৃতি ও শিক্ষার বিষয়বস্তু ভেদে শিক্ষার যোগান হয় ভিন্নতর। উন্নত অনুন্নত সব দেশের শহরে প্রাথমিক মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার যোগান প্রচুর। তাই শহরাঞ্চলে এই স্তরের শিক্ষার যোগান প্রতিযোগিতামূলক যা উচ্চ শিক্ষাস্তরে দেখা যায় না। কারণ উচ্চশিক্ষার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও যেমন কম তেমনি ব্যক্তিগত পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশও প্রয়োগও তেমনিভাবে সীমিত।

শিক্ষার দুই প্রকারের চাহিদা নিরূপণ করা যায়। যথা–

ক. শিক্ষার স্বল্পমেয়াদী চাহিদা
খ. শিক্ষা দীর্ঘমেয়াদী চাহিদা

শিক্ষার স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী চাহিদা নিরূপণের ক্ষেত্রে তারতম্য রয়েছে। শিক্ষা পরিকল্পনার সময়কাল সাধারণত ১০-২০ বছর। শিক্ষা চাহিদার এই দীর্ঘমেয়াদী বৈশিষ্ট্যের কারণে সময়ের ব্যবধানে মানুষের রুচি, জীবনযাত্রার মান, সামাজিক পরিকাঠামোর পরিবর্তন ঘটে। তাই অন্যান্য ক্ষেত্রে চাহিদা নিরূপণে “অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকবে” এই শর্ত শিক্ষাক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না। জীবনের শর্তানুযায়ী বাস৩ব পরিমণ্ডলে শিক্ষাব্যবস্থা এবং

সমাজব্যবস্থা উভয়ক্ষেত্রে নিরন্তর পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। এই নিরন্তর পরিবর্তন শিক্ষা চাহিদার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নিয়ন্ত্রক।

- শিক্ষার সামাজিক চাহিদা
- শিক্ষার ব্যক্তিগত চাহিদা

বিনিয়োগ হিসাবে শিক্ষা

শিক্ষা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং ব্যক্তিগত আয়ের সফল নিয়ন্ত্রক। মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করে তার দক্ষতা ও সামর্থ্যের বৃদ্ধি ঘটায়। শিক্ষা ভবিষ্যতের আয় এবং উপযোগ বৃদ্ধি করে। শিক্ষা বর্তমান সম্পদ ব্যবহার করে ভবিষ্যত উপযোগ বৃদ্ধ করে। শিক্ষাখাতে এক টাকা বিনিয়োগ করলে তার ঊনিশ গুণ সুফল পাওয়া যাবে। পোশাক বা অন্য কারখানার শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বাড়াতে এক টাকার বিনিয়োগে ৫ টাকা ৪০ পয়সার সুফল পাওয়া সম্ভব। তাই একথা নি:সন্দেহে স্বীকার্য যে অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রথম অপরিহার্য শর্ত হচ্ছে শিক্ষা:

সামাজিক বিনিয়োগ হিসাবে শিক্ষা

শিক্ষা বিনিয়োগের ফলে ব্যক্তিগত প্রাপ্তির শিক্ষার সামাজিক উপযোগ রয়েছে। শিক্ষাখাতে বিয়োগের ফলে প্রাপ্ত লাভ কেবল ব্যক্তি পর্যায়ে সীমাবদ্ধ থাকে না বরং সমাজও লাভবান হয়।

শিক্ষা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন

শিক্ষা অর্থনৈতিক উন্নয়নের চাবিকাঠি। শিক্ষার মাধ্যমে জনসমষ্টি জনসম্পদে পরিণত হয়। উচ্চশিক্ষা, কারিগরী শিক্ষা, বৃত্তিমূলক শিক্ষা অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। শিক্ষা একদিকে যেমন মজুরী বৃদ্ধি করে তেমনি পরোক্ষভাবে মিতব্যয়িতা, সঞ্চয়, দৃষ্টিভঙ্গি দক্ষতা ইত্যাদিতে প্রভাব রাখে যা সামাজিক পরিবর্তন ও প্রগতির পথে গতির সঞ্চার করে। উন্নত দেশসমূহ মোট জাতীয় উৎপাদনের একটি বিরাট অংশ শিক্ষাখাতে ব্যয় করে।

উৎপাদন

উত্তম দক্ষ ও বাস্তবসম্মত শিক্ষাব্যবস্থা উচ্চতর আয় হিসাবে ব্যক্তিগত পর্যায়ে এবং অধিক উৎপাদন হিসাবে সামাজিক পর্যায়ে সর্বদা ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে । শিক্ষা মানুষের দক্ষতা ও বিশ্লেষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। শিক্ষা আবিষ্কার ও উদ্ভাবনীর বাহক। গবেষণার মাধ্যমে শিক্ষা উন্নত প্রযুক্তি ও পদ্ধতি আবিষ্কারে সাহায্য করে। যার ফলে মূলধন ও সঞ্চয়ের প্রসার ঘটে।

চাকুরী সংস্থান

প্রযুক্তি ও জ্ঞান বিজ্ঞানের দক্ষতা অর্জনে একমাত্র সহায়ক শিক্ষা। ভৌত মূলধনের উন্নত ব্যবহার অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত। চাকুরী সংস্থানের বাপারে শিক্ষা দু'ভাবে কাজ করে-

প্রথমত: অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড প্রসারের ফলে লাভজনক কাজের সম্ভাবনা বৃদ্ধি করে। দ্বিতীয়ত: প্রযুক্তিগত পরিবর্তন চাকরুরীর ধাপ প্যাটার্ণের ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনে। কায়িক পরিশ্রমের চাকুরীর স্থলে উন্নত চাকুরীর সৃষ্টি হয়। শিক্ষিত শ্রমিক কায়িক শ্রমের বদলে জ্ঞান বিজ্ঞান ব্যবহার করার মত চাকুরী করতে আগ্রহ প্রকাশ করে।

শ্রমিক গোষ্ঠীর গঠন কাঠামো অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় শিক্ষা শ্রমিক গোষ্ঠীর গঠন কাঠামোকে উল্লেখযোগ্যবাবে প্রভাবিত করে। শিশু শ্রমের পরিবর্তে বয়স্ক শ্রমের সংযোজন জনগণ ও রাষ্ট্রের কল্যাণ সাধন করে। এজন্য প্রত্যেক দেশে সার্বজনীন শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

কাজ ও জীবন সম্পর্কে মূল্যবোধ

একথা সকলে স্বীকার করেন যে কাজ সম্পর্কে সঠিক মূল্যবোধ গঠনে সহায়তা করে শিক্ষা। উন্নত দেশে শিক্ষিত কর্মীগোষ্ঠী নিজের ও পরিবার সংক্রান্ত সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম।

শিক্ষার অর্থনৈতিক অবদান

শিক্ষা দক্ষতা ও উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে ব্যক্তিগত ও সামাজিক পর্যায়ে পার্থিব সম্পদ সৃষ্টিতে সহায়তা করে।

উপরোক্ত আলোচনা শেষে বলা যায় যে শিক্ষার সাথে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। শিক্ষা প্রবৃদ্ধির পূর্বশর্ত। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির সাথে শিক্ষার সম্পর্ক সর্বজন স্বীকৃত।

শিক্ষা খরচ ও প্রত্যর্পণ

শিক্ষা থেকে প্রাপ্ত উপযোগের পরিমাপের উপর ভিত্তি করে ব্যক্তি তার শিক্ষাখানে বিনিয়োগ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। অর্থনীতিবিদগণ মনে করেন শিক্ষা বিনিয়োগের মানদণ্ড একজন ব্যবসায়ীর বিনিয়োগের মানদণ্ডের তুল্যমূল্য। একজন ব্যবসায়ী শিক্ষাখাতে বিনিয়োগের পূর্বে তার সর্ব প্রকার হিসাব কষে লাভের অংক যাচাই করে। সাথে সাথে সে আরো যাচাই করে দেখে উক্ত সমপরমাণ অর্থ সে অন্যকোন খাতে বিনিয়োগ করলে অপেক্ষাকৃত বেশি লাভবান হবে কিনা। সুতরাং শিক্ষাকে ব্যক্তিগত বিনিয়োগ হিসাবে বিশ্লেষণ করার প্রথম পদক্ষেপ শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় খরচের হিসাব করা।

শিক্ষা গ্রহণের খরচ প্রধানত তিন প্রকার।

ক. প্রত্যক্ষ খরচ
খ. পরোক্ষ খরচ
গ. সুযোগ খরচ

ক. প্রত্যক্ষ খরচ: শিক্ষার্থীর সর্ব প্রকার সুস্পষ্ট আর্থিক খরচ যথা- বেতন বই পুস্তক, যাতায়াত এই খরচের আওতায়। এই খরচ প্রকৃতপক্ষে আর্থিক খরচের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এক্ষেত্রে সরকারী নীতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

খ. পরোক্ষ খরচ: কোন শিক্ষার্থীকে একটি কোর্স গ্রহণ করার সিদ্ধান্তকালে তাকে তার সময় পুন: নির্ধারণের সমস্যা মোকাবেলা করতে হয়। শিক্ষা গ্রহণ করতে গেলে তাকে তার অবসর সময় অথবা কাজের সুযোগ পরিত্যাগ করতে হবে। কারণ সময় একটি সীমিত অর্থনৈতিক সম্পদ। অবসর যাপন একটি আকাঙ্খিত................। এই অবসাদ থেকে বঞ্চিত হওয়াকে খরচের রূপান্তরিত করা যায়। কাজের বিনিময়ে পরিশ্রমিক পাওয়া যায়। অতএব কাজ বাদ দিয়ে শিক্ষা গ্রহণের অর্থ উক্ত পারিশ্রমিক থেকে বঞ্চিত হওয়া। কাজেই এই বঞ্চিত অবসর সময় এবং কাজের পারিশ্রমিক হিসাব শিক্ষার্থীর শিক্ষা গ্রহণের পরোক্ষ খরচ হিসাবে গণ্য। পরোক্ষ খরচকে অর্থনীতির ভাষায় সুযোগ খরচ হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়।

শিক্ষার প্রত্যপর্ণ নির্ধারণের জন্য প্রথমে একটি বাড়তি ডিগ্রি লাভের ফলে অর্জিত অর্থনৈতিক সুবিধাগুলি হিসাব করা হয়। সাধারণত এই অর্থনৈতিক সুবিধা ডিগ্রি অর্জনের ফলে অর্জিত হয়। বাড়তি ডিগ্রি অর্জিত না হলে ব্যক্তি এই অতিরিক্ত আয় থেকে বঞ্চিত হত। আয় বাড়া ও শিক্ষার অন্যান্য উপযোগিতা লক্ষ্য করা যায়। যেমন পরবর্তী পর্যায়ের শিক্ষা গ্রহণের ভর্তির সুবিধা, চাকুরী লাভের উপযুক্ততা বৃদ্ধি, বেকারত্বের সম্ভাবনা হ্রাস ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.১২

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. শিক্ষা একটি দেশের কোন সম্পদ তৈরি করে?
ক. মানব সম্পদ
খ. সর্বোচ্চ শিক্ষিত মানব সম্পদ
গ. অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পদ
ঘ. রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক

২. শিক্ষার চাহিদা কয় প্রকার?
ক. তিন প্রকার
খ. পাঁচ প্রকার
গ. চার প্রকার
ঘ. দুই প্রকার

৩. শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ কত প্রকার?
ক. তিন প্রকার
খ. চার প্রকার
গ. সাত প্রকার
ঘ. দুই প্রকার

উত্তরমালাঃ ১. খ, ২. ঘ, ৩. ক

খ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. শিক্ষার চাহিদা ও যোগান বলতে কী বুঝায়? এ প্রসঙ্গে আমলাতন্ত্রের বিভিন্ন দিত তুলে ধরুন।
২. শিক্ষায় আমলাতন্ত্রের বিভিন্ন দিক তুলে ধরুন।
৩. কাজ ও জীবনের মূল্যবোধ কী আলোচনা করুন।